বিচারবুদ্ধি ও কোরআনের দৃষ্টিতে

‘আলামে বারযাখ্

নূর হোসেন মজিদী

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম্।

মুখবন্ধ

মৃত্যুপারের জীবন সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য চিরন্তন। এ ঔৎসুক্যের পরিপূর্ণ নিবৃত্তি জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভব নয় জেনেও মানুষ কখনোই এ বিষয়ে জানার আগ্রহ পরিত্যাগ করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মে যেমন বিভিন্ন ধারণা দেয়া হয়েছে, তেমনি এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা তথ্য ও কল্পনা। তাই এ ব্যাপারে সম্ভব সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক ধারণার প্রয়োজনীয়তা সব সময়ই অনুভূত হয়ে আসছে।

ইসলামী মতে, সাধারণভাবে মৃত্যুপরবর্তী সময়ের দু'টি পর্যায় রয়েছে : মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময় এবং পুনরুত্থান পরবর্তী সময় অর্থাৎ শেষ বিচার ও তদ্পরবর্তী জান্নাতী বা জাহান্নামী অনন্ত জীবন। পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং বেহেশত বা দোযখ বাস তথা আখেরাতের ওপর ঈমান পোষণ ইসলামের মৌলিক চৈন্তিক ভিত্তি (উছূলে 'আক্বাএদ্)-এর অন্যতম। এ কারণে এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে বিস্তারিত বক্তব্য রয়েছে।

অন্যদিকে সুস্থ বিচারবুদ্ধি পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং শাস্তি ও পুরষ্কারের প্রয়োজনীয়তাকে যেমন অনস্বীকার্য গণ্য করে তেমনি তার সম্ভব হওয়াও স্বীকার করে। বিশেষ করে কোরআন মজীদে এ ব্যাপারে যে সব বিচারবুদ্ধির দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হচ্ছে, যিনি

প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনঃসৃষ্টি করবেন অর্থাৎ প্রথম বার সৃষ্টির তুলনায় পুনঃসৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ও তা সম্ভব হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা একমাত্র বিচারবুদ্ধি বর্জনকারী ও নাস্তিকতায় অন্ধ বিশ্বাসী একগুঁয়ে ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

কিন্তু মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়টিতে মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সংক্রান্ত ধারণা শেষ বিচারের ধারণার গুরুত্বের অনুরূপ গুরুত্বের অধিকারী না হলেও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যদিকে এ অধ্যায়টি সম্বন্ধেই মানুষের ঔৎসুক্য সবচেয়ে বেশী।

মানবিক বিচারবুদ্ধি পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতাকে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারে। কারণ, মহাজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টির মৃতদেহের বিক্ষিপ্ত বস্তুকণাগুলোকে কেবল তাঁর ইচ্ছাশক্তিবলে একত্রিত করে তাদেরকে পুনঃসৃষ্টিকরণ মোটেই কঠিন হতে পারে না। কিন্তু মানুষ জানতে চায়, মৃত্যুর পরে শরীর থেকে 'আত্মা' বিচ্ছিন্ন হবার পর মানুষের অবস্থা কী হয়ে থাকে।

অবশ্য ওয়ায্-নছ্বীহতে ও এতদসংক্রান্ত বই-পুস্তকে 'ক্বর আযাব্' একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এতে সাধারণতঃ প্রকৃত ছ্বহীহ্ হাদীছের সাথে নিখুঁত বিচারে ছ্বহীহ্ নয় এমন বহু হাদীছ এবং বহু ভিত্তিহীন কিচ্ছা-কাহিনীর সমাহার ঘটে থাকে। এ সব ওয়ায্-নছ্বীহত্ ও এতদসংক্রান্ত বই-পুস্তকে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্) ও কোরআন মজীদের দলীলের ব্যবহার

কদাচিৎ দেখা যায়। তাছাড়া এ বিষয়ে এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যা চিন্তাশীল শ্রোতা বা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে বহু প্রশ্নের জন্ম হয়। কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় না। যেমন : ক্ববরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তি ও পুরষ্কারের কথা বলা হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'ক্ববর' বলতে মাটির বুকে খননকৃত ক্ববরকে বুঝানো হয় - যা আদৌ ঠিক নয়।

ওয়ায্-নছ্বীহতে ও এতদসংক্রান্ত বই-পুস্তকে যা বলা হয় মোটামুটিভাবে তা হচ্ছে এরূপ যে, মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরস্থ করার পর পরই মাটির ক্ববরের ভিতরেই তার বস্তুগত শরীরে তার 'রূহ্' কে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে তুলে বসানো হয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতঃপর, ক্ববরস্থ ব্যক্তি গুনাহ্গার হলে ক্ববরের দু'পাশের মাটি এসে তার শরীরকে পিষে ফেলে। এ থেকে মনে হয় যে, এরূপ ব্যক্তির ক্ববর খুলে দেখলে তার শরীরকে পিষে ফেলা মণ্ডের অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু আসলে তা ঘটে না। চরম পাপাচারী ব্যক্তির মৃতদেহ মৃত্যুর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পোস্ট্ মর্টেমের জন্য তুললে দেখা যায় যে, মৃতদেহটি ঠিক যেরূপ রাখা হয়েছিলো ঠিক সে রকমই রয়েছে।

অবশ্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা মুখে মুখে প্রচার হতে শুনা যায়। যেমন : বলা হয় যে, অমুক জায়গায় জনৈক পাপাচারী ব্যক্তির ক্ববর থেকে আগুন বেরিয়েছে, বা ক্ববর খুঁড়তে গিয়ে কিছুতেই খোঁড়া সম্ভব হচ্ছিলো না; চারপাশ থেকে মাটি এসে ক্ববর ভরে যাচ্ছিলো বিধায়

তাকে মাটিচাপা দেয়া হয়, ইত্যাদি। এগুলো সাধারণতঃ বানানো গল্প অথবা কারসাযী। ক্ষেত্রবিশেষে শুনা যায় যে, ক্কবর স্থানান্তরের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন পরেও নেককার ব্যক্তির মৃতদেহ স্যাঁতসেঁতে জায়গায়ও পচনমুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর অবশ্য স্বাস্থ্যবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে।

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে বান্দাহদের শিক্ষা দেয়া ও সতর্ক করার জন্য যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত করতে পারেন, কিন্তু মানুষকে আল্লাহ্ 'আক্বল্ দিয়েছেন এবং এরপরও তার হেদায়াতের জন্য কোরআন মজীদ নাযিল করেছেন; অতঃপর সাধারণভাবে কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির বরখেলাফে কোনো কিছু না করাই আল্লাহ্ তা'আলার সুন্নাত্। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে গণ-আযাব্ বা ব্যক্তিগত আযাব নাযিল করা হয় তা-ও সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বিধানে শক্তিসঞ্চারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

ক্কবর আযাব্ সংক্রান্ত ঐ সব ব্যাখ্যায় আরো সমস্যা আছে। তা হচ্ছে, ক্কবর আযাবের জন্য মাটির ক্কবর এবং মরদেহে "রূহ্" প্রত্যাবর্তন করানো শর্ত হলে যাদের দেহ মমি করে রাখা হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা পচেগলে পানিতে মিশে যায় বা মাছের পেটে চলে যায় অথবা পচেগলে না গিয়েই বাঘের পেটে বা কুমীরের পেটে চলে যায় তাদের জন্য ক্কবর আযাব হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ার কথা। তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ালো? একজন গুনাহ্গার মুসলমান ক্কবরের সওয়াল্-জবাব ও ক্কবর আযাবের মুখোমুখি হবে, আর যে অমুসলিমের মৃতদেহ মমি করে রাখা হয়েছে সে এ আযাব থেকে

বেঁচে যাবে?! সুতরাং সুস্পষ্ট যে, সওয়াল্-জবাব্ ও ক্বরব আযাবের এ ধরনের ব্যাখ্যা আদৌ ঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপরিহার্য মনে করছি যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত সর্বজনীন মানদণ্ড 'আক্বল্ (বিচারবুদ্ধি)- যা প্রয়োগের জন্য কোরআন মজীদ বার বার তাকিদ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত্ কোরআন মজীদ, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) থেকে প্রতিটি স্তরে বিরাট সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত তথা মুতাওয়াতির্ হাদীছ্ - যা তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত বলে প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের প্রথম যুগের সমগ্র উম্মাহর সর্বসম্মত বিষয়সমূহ (ইজমা 'এ উম্মাহ্) - যা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর সুন্নাতের উদ্ঘাটনকারী-ব্যতীত অন্য কোনো দলীলের দ্বারাই ইসলামী 'আক্বাএদের তিন মূলনীতির (তাওহীদ্, আখেরাত্ ও নবুওয়াতের) শাখা-প্রশাখা সমূহ এবং ফরয ও হারামের কোনো বিষয়ই প্রমাণিত হয় না।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত হাদীছগ্রন্থ সমূহে স্থানপ্রাপ্ত কোনো না কোনো স্তরে, বিশেষ করে প্রথম দিককার কোনো স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত (খবরে ওয়াহেদ্) হাদীছ কেবল উপরোক্ত চার অকাট্য জ্ঞানসূত্রের কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাকরূহ্) ও প্রায়োগিক বিষয়ে গ্রহণযোগ্য। এমনকি মুতাওয়াতির্ হাদীছ্ বা ইজমা 'এ উম্মাহ্ও যদি 'আক্বল্ বা কোরআন

মজীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয় (যদিও কার্যতঃ এরূপ হয় না, তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে, যদি হয়) তাহলে সংশ্লিষ্ট হাদীছের তাওয়াতোরে সন্দেহ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ইজমা ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করতে হবে। মোদ্দা কথা, 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন যা কিছু নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে তাকে তাঁর নামে রচিত বলে গণ্য করতে হবে।

সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী ও পুনরুত্থান পূর্ববর্তী জগত অর্থাৎ 'আলামে বারযাখের অবস্থা সম্বন্ধে কথা বলার জন্য 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদের দলীল অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, এ বিষয়ে ওয়ায্-নছ্বীহতে ও বই-পুস্তকে 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদের দলীল ব্যবহার করতে দেখা যায় না। ফলে ইসলামের সকল বিষয়ের ব্যাপারেই সংশয় সৃষ্টি করা যাদের কাজ তারা ক্বর আযাব্ সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে 'আলামে বারযাখের সত্যতাই অস্বীকার করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খাঁটি ইসলামের সমর্থক হিসেবে দাবী করে ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতে গিয়ে এ সব বিষয়কে কাজে লাগায় এবং বলে যে, ক্বর আযাবের বিষয়টি 'মোল্লা' দের আবিষ্কার; ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। আর যেহেতু প্রচলিত ধারণায় মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী অবস্থা বলতে কেবল সওয়াল-জবাব ও ক্বর আযাবের কথা বলা হয়, ফলে এটি

অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে কার্যতঃ 'আালামে বারযাখের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়।

বিশেষ করে বিগত বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামের মৌলিক চৈন্তিক ভিত্তিসমূহ ও এর শাখা-প্রশাখা সমূহ এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানসমূহের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে। এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা এবং বুদ্ধিজীবী হবার দাবীদার এক শ্রেণীর লোক এ অভিযানের প্রথম কাতারে স্থান গ্রহণ করেছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা চালাবার ছোট-বড় কোনো সুযোগই হাতছাড়া করে না। এদের মধ্যে কতক লোক নিজেদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলেও দাবী করে থাকে, যদিও ইসলাম সম্পর্কে তাদের কোনো মৌলিক জ্ঞান নেই. বরং ইসলাম-বিদ্বেষী পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের বিদ্বিষ্ট বই-পুস্তক থেকে প্রাপ্ত বিকৃত ধারণাই হচ্ছে এদের ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র সম্বল।

এ ধরনের একজন ইসলাম-বিশেষজ্ঞ সাজা ব্যক্তি ইসলাম-বিরোধী হিসেবে কুখ্যাত একটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন। ১৯৯৬-র মাঝামাঝি সময়ে পত্রিকাটির এক সংখ্যায় তিনি ক্কবর আযাব্ অস্বীকার করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি দাবী করেন যে, ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। এছাড়াও ঐ ব্যক্তি উক্ত কলামে আমার ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব গ্রন্থের মনগড়া সমালোচনা করেন, কিন্তু আমি তা খণ্ডন করে বক্তব্য দিলে

তা প্রকাশ করা হয় নি। এছাড়াও তাঁর আরো কতক লেখার ভ্রান্তি নির্দেশ করে বক্তব্য দিলে তা-ও প্রকাশ করা হয় নি।

পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তি সাপ্তাহিক রোববার-এ নিয়মিত ইসলাম বিষয়ক কলাম লিখতে শুরু করলে এবং তাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকলে আমি তা খণ্ডন করে বক্তব্য দিতে থাকি এবং রোববার কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ করতে থাকেন। পর পর অনেকগুলো সপ্তাহ্ উভয়ের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকলে এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিটি লেখাই ফালতু প্রমাণিত হলে রোববার কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তির কলামটি বন্ধ করে দেন। সম্ভবতঃ একই কারণে, উল্লিখিত দৈনিকটি থেকেও তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়।

ইসলাম-বিরোধী হিসেবে কুখ্যাত দৈনিকটিতে যখন ক্বর আযাব অস্বীকার করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আমি তখন দৈনিক আল্-মুজাদ্দেদ-এর 'ইসলাম ও ঐতিহ্য' বিভাগে কর্মরত ছিলোম। তখন আমাকে ক্বর আযাব বিষয়ে একটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনুভব করলাম যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ঐ সময় দৈনিক আল্-মুজাদ্দেদ-এ (অন্য এক বিভাগে) কর্মরত আমার সাবেক সহকর্মী (আমি বার্তাবিভাগে কর্মরত থাকাকালীন সহকর্মী) হিরণ ভাই (শহীদুল হক হিরণ -মরহূম কবি মোজাম্মেল হক-এর পুত্র) এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার জন্য অমাকে বার বার অনুরোধ জানান। কিন্তু আল্-মুজাদ্দেদ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বেশী দীর্ঘ লেখা না লেখার জন্য নির্দেশ

ছিলো। এ সত্ত্বেও আমি আমার নিজস্ব বিন্যাসে “ইসলামের দৃষ্টিতে ‘আলামে বারযাখ্’” প্রবন্ধ রচনা করি। ১৯৯৬-র ১৬ই ও ২১শে নভেম্বর সংখ্যায় প্রবন্ধটির প্রথম দুই অংশ প্রকাশিত হবার পর এটির প্রকাশ তিন সপ্তাহ্ স্থগিত থাকে। এরপর ১৫ই, ১৮ই ও ১৯শে ডিসেম্বর প্রবন্ধটির বাকী তিন অংশ প্রকাশিত হয়।

ঐ সময়ই পরবর্তীকালে প্রবন্ধটিকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের চিন্তা মাথায় আসে। হিরণ ভাইও এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মূল প্রবন্ধটি যে বিন্যাসে লিখেছিলাম আল্-মুজাদ্দেদে প্রকাশকালে তাতে কিছু পরিবর্তন আনা হয় -যার উদ্দেশ্য ছিলো সংক্ষেপকরণ। ফলে বক্তব্যে সামান্য বিন্যাসদুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই অত্র গ্রন্থে প্রবন্ধটি পুনর্বিন্যস্ত করি, কিন্তু তাতে হয়তো বিন্যাসের দুর্বলতা পুরোপুরি দূরীভূত হয় নি। এতে উপশিরোনামসমূহ ও কোরআন মজীদের মূল আয়াত সমূহ পরে সংযোজন করি। এছাড়া প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় আরো কিছু বক্তব্য সংযোজন করি যার ফলে মূল প্রবন্ধটির আয়তন বৃদ্ধি পায়।

অভিন্ন বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় তখন এ গ্রন্থে “‘আলামে বারযাখে শহীদের জীবন” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করি। প্রবন্ধটির মূল শিরোনাম এটি হলেও সামান্য পরিবর্তিত শিরোনামে এটি ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যা আল্-মুজাদ্দেদ-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থের বক্ষ্যমাণ বিন্যাসে উক্ত প্রবন্ধটিকে মূল আলোচনায় একীভূত করেছি।

আলোচ্য বিষয় অনুধাবনে সহায়ক হবে বিবেচনায় গ্রন্থের শেষাংশে "রূহ্, নাফ্স্ ও জিসমে মিছালী" এবং "'আলামে মিছাল্ ও 'আলামে বারযাখ্" শীর্ষক আরো দু'টি প্রবন্ধ সংযোজন করি। প্রবন্ধ দু'টি একাধিক বার যথেষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে সর্বশেষ রূপ লাভ করে। এছাড়া আল্-মুজাদ্দেদ-এ কর্মরত থাকাকালে কর্তৃপক্ষীয় তাগাদায় "দর্শন, ইরফান্ ও কোরআনের দৃষ্টিতে রূহ্ ও নাফ্স্" শীর্ষক আরেকটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ রচনায় হাত দেই। কিন্তু প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি লেখার পরে পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটে এবং লিখিত অংশের প্রথমার্ধ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের রূপ দেয়া হয়। পারবর্তীকালে এটিকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করে আমার লেখা নূরে মুহাম্মাদীর মর্মকথা গ্রন্থে পরিশিষ্ট আকারে সংযোজন করি। এটিকে অধিকতর সম্প্রসারিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত "রূহ্, নাফ্স্ ও জিসমে মিছালী" প্রবন্ধের রূপ দেই। গ্রন্থের বক্ষ্যমাণ বিন্যাসে এটি সংশোধিত রূপে 'কোরআন মজীদে ও দর্শনে 'আলামে বারযাখের তাৎপর্য' শিরোনামে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া ঐ সব লেখা পুনর্বিন্যাসকালে কিছু নতুন উপশিরোনাম যোগ করেছি।

এখানে কৈফিয়ত স্বরূপ দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যরূরী মনে করছি। প্রথম বিষয়টি এই যে, অত্র গ্রন্থটি গ্রন্থরচনার পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত হয় নি, বরং, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ হিসেবে লেখা হয়েছিলো। পরে এটিকে সম্প্রসারিত করে গ্রন্থের রূপ দেয়ার

ফলে বিন্যাসে দুর্বলতা ছাড়াও কিছু কথার পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভবপর হয় নি। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, মানুষের অবস্তুগত সত্তার সংখ্যা ও নাম নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। এ নিয়ে অত্র গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হলেও মূল প্রবন্ধটি রচনাকালে সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রধানতঃ 'রূহ্' বা 'আত্মা' ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালীন সংযোজনসমূহে প্রধানতঃ 'নাফ্স্' বা 'ব্যক্তিসত্তা' ব্যবহার করা হয়েছে - যা অধিকতর যথার্থ। এ ক্ষেত্রে পরিভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও যা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা অভিন্ন অস্তিত্ব।

গ্রন্থটি একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশের কথা হলে তার ভিত্তিতে এটি কম্পোজ করা হয় এবং ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে ট্রেসিং-প্রিন্ট্ তোলা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠানটি গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারে নি। কয়েক বছর পর সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারটির হার্ড ডিস্ক্ ক্র্যাশ্ করে এবং ট্রেসিংটিও নষ্ট হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে এর সর্বশেষ প্রুফ্ কপিটি পাওয়া যায়। তা থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কম্পোজ করা হলো; কম্পোজের কাজ আমার নিজেকেই করতে হয়েছে। অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নতুন কম্পোজকালে, বিশেষ করে স্বয়ং লেখক কর্তৃক কম্পোজের কারণে কিছু অংশ অপরিহার্য প্রয়োজনীয় নয় বা অকাট্য নয় বিবেচনায় বাদ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বিবেচনায় নতুন কিছু বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের বিন্যাসকেও পূর্বাপেক্ষা উন্নততর করার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও পুরো

দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হয় নি। কারণ, তা করতে গেলে অনেক বেশী সময় ব্যয় করতে হতো, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যস্ততার মাঝে তা কবে সমাপ্ত করা যেতো তার কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। বিশেষ করে কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ জন এটির সফ্‌ট্‌ কপি পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, অন্যদিকে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই সংক্ষিপ্ততম সময়ে যেভাবে সম্ভব হয়েছে কাজটি সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, গ্রন্থটি মূলতঃ বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্) ও কোরআন মজীদের দলীলের ভিত্তিতে প্রণীত। তা সত্ত্বেও এটি পত্রিকার জন্য রচনাকালে কোরআন মজীদের কতক তরজমা ও তাফসীর এবং কতক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেয়া রয়েছে। কিন্তু সে সব সূত্রের বক্তব্য হয় বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য বিধায় গ্রহণ করা হয়েছে অথবা কোরআন মজীদের আয়াতের অধিকতর সঠিক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ সব সূত্রের গৃহীত অর্থের সাথে গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত অর্থকে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তাই দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে গ্রন্থমধ্যে কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে ঐ সব সূত্রের সূত্রনির্দেশ করা হয় নি এবং 'আক্বল্ ও কোরআন ভিত্তিক রচনা হিসেবে তা উচিতও হতো না। তবে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্রনির্দেশ করলে ভালো হতো। কিন্তু আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকার লেখায় সাধারণতঃ মশহূর বা সর্বজনস্বীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে লেখার ভিতরে প্রতিটি স্থানে সূত্রনির্দেশ করা

প্রয়োজন মনে করা হয় না। তাই এ লেখাগুলোতেও তা করা হয় নি। পরে তা গ্রন্থের রূপ দেয়ার সময় কতক সূত্র হাতের কাছে না থাকায় এবং কতক সূত্র হাতের আওতায় থাকলেও সময়াভাবে তা নতুন করে খুঁজে বের করে যথাস্থানে নির্দেশ করা হয় নি। তবে গ্রন্থের শেষে এ ধরনের সবগুলো সহায়ক সূত্রের কথা এজমালীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে অকপটে স্বীকার করছি যে, কোরআন মজীদ ও 'আক্বলী দলীলের বাইরে যে সব তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়েছি তার মানে এ নয় যে, সে সব সূত্রের বক্তব্যকে অকাট্য বলে গণ্য করেছি। যেহেতু আলোচ্য বিষয়টি এমন যে, এ ক্ষেত্রে 'আক্বলের পক্ষে অনেক প্রশ্নের অকাট্য জবাব দেয়া দুরূহ ব্যাপার এবং কোরআন মজীদেও এ ব্যাপারে খুব বেশী কিছু বলা হয় নি; অবশ্য কোরআন মজীদে যতোটুকু বলা হয়েছে তা থেকে সাধারণভাবে 'আলামে বারযাখের অস্তিত্ব এবং সেখানকার শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অকাট্য; এবং অপরিহার্য তথ্য হিসেবে তা-ই যথেষ্ট। আর কোরআন মজীদ যেহেতু প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনাকারী সেহেতু কোরআন থেকে সকল বিষয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বক্তব্যের বেশী আশা করা যায় না। কারণ, সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে তা এতো বিশাল আকার ধারণ করতো যে, তা আর সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য থাকতো না।

কিন্তু মানুষের ঔৎসুক্য অনেক বেশী। এ কারণেই অনেক আনুষঙ্গিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদ ছাড়াও অন্যান্য সূত্রের সাহায্য

নিতে হয়েছে। তাই এ সব সূত্রের তথ্য উল্লেখ মানেই এ নয় যে, এগুলোকে অকাট্য গণ্য করছি। তেমনি এগুলো নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যে সব যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেয়া হয়েছে সেগুলোর অবস্থাও তা-ই। কারণ, কোনো অকাট্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যুক্তিপ্রয়োগ থেকেই অকাট্য উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়; মূল বিষয়টি অকাট্য না হলে তা থেকে যুক্তিতর্ক ভিত্তিক উপসংহার দৃশ্যতঃ অকাট্য হলেও আসলে তা অকাট্য হবার নিশ্চয়তা থাকে না। যা-ই হোক, এ থেকে ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় সে উদ্দেশ্যেই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করেছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া যে, অবশেষে গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশোপযোগী করা সম্ভবপর হলো। মূল গ্রন্থের পাদটীকাগুলো ইউনিকোডে মূল পাঠের ভিতরে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ গ্রন্থটিকে এর লেখক এবং পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বারযাখী জীবনের ও পুনরুত্থানপরবর্তী জীবনের পাথেয়স্বরূপ করে দিন। আমীন।

নূর হোসেন মজিদী
ঢাকা
২৫শে রামাযান ১৪৩৬
২৯শে আষাঢ় ১৪২২
১৩ই জুলাই ২০১৫।

‘আলামে বারযাখ্ প্রসঙ্গ ও তার পটভূমি

তাওহীদ ও নবুওয়াতের পাশাপাশি আখেরাত্ বা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন ও পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিদানের ধারণা ইসলামের তিনটি মূলনীতির অন্যতম। তবে মানুষের জীবনে প্রভাবের বিচারে আখেরাতের ধারণাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আখেরাতের ধারণা গ্রহণ না করলে তাওহীদ ও নবুওয়াতের ধারণার বাস্তব জীবনে কোনো প্রভাবই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সে ক্ষেত্রে তাওহীদ ও নবুওয়াতের ধারণা স্রেফ একটি তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়ে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

মুসলমানদের মধ্যে আখেরাত্ সংক্রান্ত বিস্তারিত ধারণায় খুটিনাটি মতপার্থক্য থাকলেও, বিশেষ করে কোরআন মজীদের বহু আয়াতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকায় এ সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা ও এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্বন্ধে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছায় এক সময় গোটা সৃষ্টিলোক ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ঐ সময় জীবিত প্রতিটি প্রাণশীল সৃষ্টিই মৃত্যুবরণ করবে। এরপর আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছায় এক নতুন জগত সৃষ্টি হবে। তখন সৃষ্টির শুরু থেকে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আগত ও আগতব্য সকল প্রাণশীল সৃষ্টিকেই দেহধারী করে পুনর্জীবিত করা হবে। অতঃপর ইহজীবনে তারা যা কিছু করেছে তার ভালো-মন্দ বিচার করে পুরষ্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

কিন্তু ক্বিয়ামত্ সংঘটিত হতে এখনো বাকী আছে। ঠিক কী পরিমাণ সময় বাকী আছে তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কারো জানা নেই; হতে পারে তা কয়েক বছর, হতে পারে কয়েক কোটি বছর। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা অনেক আগেই মৃতুবরণ করেছে তারা এখন শেষ বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে এবং যারা এখন মৃত্যুবরণ করছে ও পরে মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী সময়টা তাদের কী অবস্থায় কাটছে ও কাটবে - এ ব্যাপারে মানুষের ঔৎসুক্যের কোনো সীমা নেই।

আমাদের বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সর্বজনীনভাবে প্রচলিত সাধারণ 'আক্বীদাহ্ এই যে, মৃত্যুর পরে যখন একজন মানুষকে ক্ববর দেয়া হয় তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে ঈমান ও 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং গুনাহ্গার লোকেরা সে সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না বিধায় তাদেরকে ক্ববরে শস্তি দেয়া হয়। এরপর ভালো লোকদের আত্মাকে 'ইল্লীন্ (সমুন্নত ধাম) নামক উত্তম স্থানে আরামে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় এবং গুনাহ্গারদের আত্মাকে সীজ্জীন্ (কারাগার) নামক এক কষ্টকর অবস্থায় রাখা হয়; পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকবে। অবশ্য কিছু কিছু বই-পুস্তকে মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগতকে 'আলামে বারযাখ্ বলে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় বটে - যার নামকরণ অবশ্যই সঠিক,

কিন্তু এ জগতের অবস্থা সম্বন্ধে উপরোক্ত সওয়াল্-জবাব ও ক্ববর আযাব ছাড়া আর কোনো কিছুর উল্লেখ তেমন একটা দেখা যায় না।

এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রচলিত দ্বীনী বই-পুস্তকে ও ওয়ায্ মাহ্ফিলে মৃত্যুপরবর্তী জগত প্রসঙ্গে স্ববিরোধিতাও দেখা যায়। কারণ, অনেক সময় ক্ববরের সওয়াল-জবাবের পর পরই গুনাহ্গারদের জন্য ক্ববর আযাব ও এরপর দ্বীনদারদের জন্য 'ঈল্লীন্ ও গুনাহ্গারদের জন্য সিজ্জীনের কথা বলা হয়। আবার অনেক সময় গুনাহ্গারদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী আযাবের কথা এবং নেককারদের আত্মাকে কোনোরূপ পুরষ্কার না দিয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় রেখে দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু ক্ববরের জগতে অর্থাৎ 'আলামে বারযাখে যে সুখ-শান্তি আছে সে সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা করা হয় না। এছাড়া দো 'আ ও দান-ছ্বাদাক্বাহ্ থেকে ছ্বাওয়াব্ পাওয়ার আশায় আত্মাদের স্বজনদের কাছে এসে ঘোরাফেরার কথাও বলা হয়।

মোদ্দা কথা, এ বিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণায় কোনো একক ও সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুপস্থিত এবং এতে অস্পষ্টতা, বিক্ষিপ্ততা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। তবে "ক্ববর আযাব্" একটি সর্বজনীন ও বহুলপরিচিত পরিভাষা। যেহেতু এ বিষয়ে যারা আলোচনা করেন তাঁদের আলোচনার পিছনে মূল উদ্দেশ্য হয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা, সেহেতু এতদসংক্রান্ত লেখা ও ওয়ায্-নছ্বীহতের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই "ক্ববর আযাব" সংক্রান্ত।

এছাড়া একদিকে যেমন 'আালামে বারযাখ্ বা ক্ববরের জগতের প্রকৃত অবস্থা তথা সেখানকার সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যেমন অস্পষ্টতা ও বিতর্ক রয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিক কালে ইসলাম-বিশেষজ্ঞ হবার দাবীদার কোনো কোনো লোকের পক্ষ থেকে এরূপ একটি জগতের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে অর্থাৎ তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব ও শেষ বিচারের বিষয়টি স্বীকার করলেও 'আালামে বারযাখ্ বা ক্ববরের জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন।

এদের মতে, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়টা ঘুমের মতো। অর্থাৎ মৃতদের আত্মা কোটি কোটি বছর ঘুমের মতো অবস্থায় কাটিয়ে দেবে, এরপর তারা দেহধারী হয়ে পুনরুত্থিত হবে। তাঁরা মৃত্যুর পরে ও পুনরুত্থানের আগে মৃতদের নাফ্স্-এর (প্রচলিত কথায় আত্মার) জন্য কোনোরূপ আনন্দ-বিষাদ, ভালো-মন্দ বা পুরষ্কার ও শাস্তির ধারণা মেনে নিতে রাযী নন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ব্যক্তি পাপ-পুণ্য যা-ই করে থাকুক না কেন, বিচারের আগে তাদের শাস্তি বা পুরষ্কার লাভের (অল্প মাত্রায় হলেও) ধারণা অযৌক্তিক।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, সাম্প্রতিক কালে এ ব্যাপারে দৃশ্যতঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ধরনের কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভ্রমাত্মক এমন ধরনের প্রচারণাও চালানো হয়েছে এবং প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে তা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে - যা অনেকের মনে সংশয় ও চৈন্তিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

অবশ্য আলমে বারযাখ্ অস্বীকারকারীদেরকে একতরফাভাবে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে 'আলামে বারযাখ্ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ না করা এবং ক্বরের জীবনের অবস্থা সংক্রান্ত প্রচলিত ওয়ায্-নছ্বীহত্ ও এতদসংক্রান্ত বই-পুস্তকে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত বক্তব্যের পরিবর্তে এলোমেলো ও অগভীর বক্তব্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশীল লোকদের মনে এ ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করবে - এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ঐ সব ওয়ায্-নছ্বীহত্ ও এতদ্সংক্রান্ত বই-পুস্তকে 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদের দলীল - যা অকাট্য দলীল - কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং যে সব হাদীছ উদ্ধৃত করা হয় সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয় না। এছাড়া কোরআন-হাদীছ বহির্ভূত এমন অনেক কিচ্ছা-কাহিনী জুড়ে দেয়া হয় যেগুলো প্রামাণ্য নয় এবং দলীল হিসেবে যেগুলোর কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। ফলে এ ধরনের দুর্বল উপস্থাপনা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কেই দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

কিন্তু কোনো প্রতিপাদ্য বিষয়কে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করা হলেই যে, মূল বিষয়টি বাত্বিল বলে গণ্য হবে এমন কোনো কথা নয়। বরং কোনো বিষয়কে (মূল বিষয়কে, বিস্তারিত বক্তব্যকে নয়) গ্রহণ ও বর্জন উভয় ক্ষেত্রেই অকাট্য দলীল-প্রমাণ অপরিহার্য। তাই মৃত্যুপরবর্তী ও পুনরুত্থানপূর্ববর্তী জগতের সুখ-দুঃখের বিষয়টিকেও কেবল অকাট্য দলীল-প্রমাণের আলোকে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

এখানে আলোচ্য বিষয়টিকে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে : মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিশেষভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু বিষয়টি জীবিত মানুষদের অভিজ্ঞতার জগতের বহির্ভূত একটি বিষয় সেহেতু এ ব্যাপারে সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ফয়ছ্বালায় উপনীত হওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। আর সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ফয়ছ্বালায় উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি যেমন সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া অপরিহার্য হবে না তেমনি তা অকাট্যভাবে বাত্বিল বা বর্জনীয় বলেও গণ্য করা যাবে না। কারণ, কোনো বিষয়ে অকাট্য জ্ঞানে উপনীত হতে না পারার মানে কখনোই মূল জ্ঞাতব্য অজ্ঞেয় বিষয়টির অনস্তিত্ব নয়। অন্যদিকে বিষয়টি জীবিত মানুষদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিধায় এ ব্যাপারে ইসলামী সূত্রসমূহের অকাট্য ফয়ছ্বালা মেনে নেয়া মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে কোনো ফয়ছ্বালা কেবল তখনই ইসলামী ফয়ছ্বালা হিসেবে পরিগণিত হবে যখন তা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রমাণের জন্য অবশ্যই যে কোনো ধরনের দুর্বল, বিতর্কিত ও সংশয়মূলক দলীলের (তাকে যদি ছ্বহীহ্ বলে 'দাবী ' করা হয়েও থাকে) আশ্রয়গ্রহণ পরিহার করতে হবে। কারণ, কোনো সঠিক বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে দুর্বল, বিতর্কিত ও সংশয়মূলক দলীলের আশ্রয়গ্রহণ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতাকেই সংশয়াপন্ন করে তোলে, এমনকি

ক্ষেত্রবিশেষে তাকে প্রত্যাখ্যাত করে তোলে। তাই এ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণের বেলায় কেবল অকাট্য ইসলামী জ্ঞানসূত্র অর্থাৎ 'আক্বল্ ও কোরআন মজীদ এবং এ দুই মানদণ্ডের বিচারে অকাট্য প্রমাণিত সূত্রের আশ্রয় নেয়া যাবে; এর বহির্ভূত অন্য যে কোনো দলীল থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে, প্রধানতঃ শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে, ফয়ছ্বালায় উপনীত হওয়ার জন্য অকাট্য দলীল পাওয়া যায় না সে সব ক্ষেত্রে কেবল 'সম্ভাব্য জবাব' হিসেবে অন্যান্য সূত্রের বক্তব্যকে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)-এর আলোকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিচারবুদ্ধির মানদণ্ড কেন

আমরা আমাদের আলোচনায় প্রধানতঃ তিনটি অকাট্য জ্ঞানসূত্রের আশ্রয় নিয়েছি, তা হচ্ছে : বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্), কোরআন মজীদ ও প্রথম যুগ থেকে চলে আসা মুসলমানদের সর্বসম্মত মত ও আমল - যাকে আমরা ইজমা ‘এ উম্মাহ্ নামকরণ করেছি - যা অকাট্যভাবে সুন্নাতে রাসূল (ছ্বাঃ)-এর উদ্ঘাটনকারী। অবশ্য আমরা বস্তুবিজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অকাট্য দলীলও বিবেচনায় নিয়েছি, তবে তা বিচারবুদ্ধির দলীলেরই সম্প্রসারণ হিসেবে মাত্র।

তিনটি কারণে আলোচ্য বিষয়ে বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্)কে অন্যতম মানদণ্ড বা অকাট্য জ্ঞানসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সর্বজনীনকরণ অর্থাৎ বিষয়টিকে শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা, দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধির কারণে যে সব ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এমন অনেক বিষয়েও বিচারবুদ্ধির দলীল ছাড়া অনেক লোকের পক্ষেই মানসিক নিশ্চিন্ততার অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয় না। তৃতীয়তঃ স্বয়ং কোরআন মজীদ বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্) কাজে লাগানোর ওপর বার বার তাকিদ করেছে।

বস্তুবাদীরা বস্তুর বাইরে কোনো অবস্তুগত অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে না। এ কারণে তারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণশীল অস্তিত্বকে বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল বলে দাবী করে অর্থাৎ তারা বস্তু-উর্ধ আত্মার (নাফ্স্-এর) এবং সৃষ্টিকর্তা ও পরকালের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ফলে স্বভাবতঃই তারা 'আলামে বারযাখ্ বা ক্ববরের জীবনের অস্তিত্বও স্বীকার করে না। কিন্তু সুস্থ বিচারবুদ্ধি মানুষের বস্তুগত শরীর জুড়ে অবস্থানরত বস্তু-উর্ধ সত্তা (নাফ্স্/ আত্মা) ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং পরকালের দৃঢ় সম্ভাবনার পক্ষে রায় প্রদান করে; কেবল অন্ধ প্রবৃত্তিপূজারীদের পক্ষেই সে রায় প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। [এ বিষয়ে আমি আমার জীবন জিজ্ঞাসা গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।]

দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধির দলীল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতা দূরীকরণে সহায়ক হয়। বিশেষ করে যারা বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে কোরআন মজীদের আয়াতের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যকেও রূপকভাবে ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত বিচারবুদ্ধির দলীল তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরীকরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা

[এ সম্পর্কে আমার জীবন জিজ্ঞাসা গ্রন্থের 'বিচারবুদ্ধি ও ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; এখানে সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হলো।]

ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সুস্থ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে উৎসাহিত করা এবং ইসলাম তার মৌলিক দাও 'আত্-কে সুস্থ বিচারবুদ্ধির কাছেই উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন না থাকার কারণে অনেকেই দ্বীনের মৌলিক উপস্থপনাসমূহের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়ার বিরোধিতা করেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে : বিচারবুদ্ধি ভুল করতে পারে।

তাঁদের এ যুক্তির জবাব হচ্ছে এই যে, জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত মহাসত্য সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাবে সুস্থ বিচারবুদ্ধি ('আক্বলে সালীম্)-এর ভুল করার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর বিচারবুদ্ধি যদি ভুল করেও, তো তা বিচারবুদ্ধিভিত্তিক পর্যালোচনার সাহায্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম। অর্থাৎ কেউ যদি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে তো পরবর্তীতে তার নিজের বিচারবুদ্ধিই, অথবা অন্যদের কারো না কারো বিচারবুদ্ধি তা ধরতে সক্ষম হবে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কোনো ধর্ম নয়। অন্য সমস্ত ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের নিকট আবেদন করে, কিন্তু ইসলাম তার বিপরীতে মানুষের বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করে। যারা একাধিক খোদার বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের সে বিশ্বাসের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আসলে একই বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও যুক্তি একত্রে চলতে পারে না। অন্যদিকে ইসলাম জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত মহাসত্য সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির দলীল অর্থাৎ যুক্তি উপস্থাপন করেছে। স্বয়ং কোরআন মজীদ

আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করেছে, যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে বলেছে :

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)

"এতদুভয়ে (আসমান ও যমীনে) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ থাকতো তাহলে এতদুভয় ধ্বংস হয়ে যেতো।" (সূরাহ্ আল্-আম্বিয়া' : ২২)

এভাবে তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত্ প্রশ্নে কোরআন মজীদ বহু বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য দলীল বা যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এভাবে বিচারবুদ্ধির দলীল উপস্থাপনের কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত মহাসত্য খুঁজে পাবার ক্ষমতা স্বরূপই বিচারবুদ্ধি দান করেছেন। তাই সকল মানুষের নিকট অভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)। অন্যান্য ধর্ম যেভাবে তাদের মৌলিক উপস্থাপনাগুলোকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল করেছে ইসলামও যদি সেভাবেই মানুষের কাছে অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আবেদন পেশ করতো তাহলে ইসলামের আবেদন সত্য হওয়া সত্ত্বেও কেউ তা গ্রহণ করতো না। কারণ, অন্ধ বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ নিজ বিশ্বাসের অনুসরণ করবে। তাই কোরআন মজীদ বার বার বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছে। কোরআন মজীদে কম পক্ষে তেরো বার এরশাদ হয়েছে : افلا تعقلون؟ -"অতঃপর তোমরা কি বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?"

বিচারবুদ্ধি অবশ্য খুঁটিনাটি ও বিশেষজ্ঞত্ব পর্যায়ের বিষয়াদিতে স্বাধীনভাবে ফয়ছ্বালা দিতে সক্ষম নয়, কিন্তু জীবন ও জগতের পিছনে নিহিত

মৌলিকতম সত্যসমূহ উদ্ঘাটনে সক্ষম। সুতরাং যে কেউ এ বিষয়ে বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে সে-ই তাওহীদ, আখেরাত্ ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (ছ্বাঃ)-এর সত্যতায় উপনীত হবে। অন্যদিকে কোরআন মজীদের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রগুলোতে বিচারবুদ্ধি সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সুতরাং মত্যুপরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগত - যা আখেরাত সংক্রান্ত ধারণারই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সে সম্পর্কে প্রথমেই আমরা বিচারবুদ্ধির দ্বারস্থ হবো। কারণ, যদিও বিচারবুদ্ধি এতদসংক্রান্ত খুঁটিনাটি উদ্ঘাটনে সক্ষম নয়, তবে মত্যুপরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগতের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে পথনির্দেশ দানে সক্ষম। এরপর আমরা দেখবো যে, এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে কী আছে।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও আত্মার অস্তিত্ব

সর্বজনীন মানদণ্ডের দৃষ্টিতে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির আলোকে 'আালামে বারযাখ্ সংক্রান্ত আলোচনা সৃষ্টিকর্তা ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যদি না থাকে অথবা থাকলেও মানুষের বস্তুগত শরীর ছাড়া কোনো অবস্তুগত সত্তা বা আত্মা যদি না থাকে তাহলে 'আালামে বারযাখের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যদি কেবল বস্তুগত অস্তিত্ব হয়ে থাকে এবং তার প্রাণশীলতা - নাস্তিকরা যেমন দাবী করে থাকে - যদি কেবল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তো সে ক্ষেত্রে মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যাবার কথা; মৃত্যুর পরে সুখ-দুঃখের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমরা প্রথমেই বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে স্রষ্টা ও আত্মার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্বন্ধে ফয়ছ্বালায় উপনীত হবো। [এ বিষয়ে আমার লেখা জীবন জিজ্ঞাসা গ্রন্থে বিচারবুদ্ধির আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় বিষয়টির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।]

বিচারবুদ্ধির আলোকে স্রষ্টা ও আত্মা (নাফ্স্) দর্শন ও 'আক্বাএদের দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'আালামে বারযাখ্ সেহেতু আমরা এখানে স্রষ্টা ও আত্মা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাধীন বস্তুজগত হচ্ছে কারণ ও ফলশ্রুতির (Cause and Effect) প্রাকৃতিক বিধান অনুসরণের জগত - এ এক অনস্বীকার্য সত্য। এ বিশ্বের সদাপরিবর্তনশীলতা এবং এতে কার্যকর কারণ ও ফলশ্রুতির বিধি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর একটি সূচনা আছে। বস্তুবিজ্ঞানীরা এ বিশ্বজগতের সূচনা সম্পর্কে যে সব তত্ত্ব দিয়েছেন তার সবগুলোই অসম্পূর্ণ এবং সেগুলোর কোনোটিতেই বিশ্বজগতের সূচনার পিছনে নিহিত মূল কারণ বা উৎস কী তা বলা সম্ভব হয় নি।

বিশ্বজগতের সূচনা সম্পর্কে প্রদত্ত অনাদি তত্ত্ব অর্থাৎ 'বিশ্বজগত অনাদি কাল থেকে আছে; এর কোনো সূচনা নেই' - এ তত্ত্ব একটি অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। কারণ, বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন সদাপরিবর্তনশীল জগত অনাদি হতে পারে না। আর এমন সুশৃঙ্খল ও অসংখ্য প্রাকৃতিক বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত বিশ্বজগতকে আমরা যদি যুক্তির খাতিরে অনাদি বলে ধরেও নেই তথাপি মানতে হবে যে, এ শৃঙ্খলা এবং কারণ ও ফলশ্রুতি বিধি প্রমাণ করে, এ বিশ্বজগতের অন্তরালে কোনো সর্বজ্ঞানী অসীম শক্তিশালী চিরঞ্জীব সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে - যার সুপরিকল্পনা অনুসারে অনাদি কাল থেকে এ বিশ্বজগত চলে আসছে। অর্থাৎ এ বিশ্বজগত সেই পরম জ্ঞানীর অস্তিত্বেরই নিদর্শন মাত্র।

বিশ্বজগতের সূচনা সম্বন্ধে আরেকটি বস্তুবাদী তত্ত্ব হচ্ছে 'আদি বস্তু' র তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী আদিতে সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী বস্তু ছিলো। তারপর এক সময় তাতে আলোড়ন বা বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়ে গতি সঞ্চার হয় এবং তার ফলে পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সি সমূহ সৃষ্টি হয় ও পরে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে প্রাণের সৃষ্টি হয়।

বিশ্বজগতের সূচনা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গৃহীত তত্ত্ব হচ্ছে 'বিগ্ ব্যাং' বা 'মহাবিস্ফোরণ' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী অসীম ভরযুক্ত একটি আদি বস্তুকণা থেকে এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে; আদি বস্তুকণায় বিস্ফোরণের ফলে প্রথমে গ্যালাক্সিসমূহ ও পরে তা থেকে ধাপে ধাপে অন্য সব কিছু সৃষ্টি হয়।

এ উভয় তত্ত্বই অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরা হলো :

(১) অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কথিত আদি বস্তু বা অসীম ভরযুক্ত 'আদি বস্তুকণা' কোত্থেকে এলো?

(২) আদি বস্তুতে বা আদি বস্তুকণায় গতিসঞ্চার, বা বিস্ফোরণ অথবা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হবার কারণ কী? বস্তুধর্ম বা কারণ ও ফলশ্রুতির বিধি অনুযায়ী কোনো শক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক ক্রিয়া না ঘটলে বস্তুর স্থিতাবস্থায় (সে স্থিতাবস্থা স্থিরতা বা গতিশীলতা - যা-ই হোক না কেন) কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটতে পারে না। এমতাবস্থায় আদি বস্তু বা আদি বস্তুকণায় সৃষ্ট পরিবর্তনের পিছনে কোন্ কারণ ক্রিয়া করেছিলো?

(৩) যদি বলা হয় যে, আদি বস্তুতে বা আদি বস্তুকণায় এ পরিবর্তনের 'সম্ভাবনা' পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো এবং তার ফলেই এতে পরিবর্তন

সংঘটিত হয়েছিলো, তাহলে প্রশ্ন : এ সম্ভাবনা কোত্থেকে এলো? এ সম্ভাবনা ঠিক ঐ সময় কেন বাস্তবে রূপ নিলো? ঐ সময়ের আগে বা পরে নয় কেন? তাহলে কি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিলো যে, ঐ সময়ই এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেবে? যদি তা-ই হয়ে থাকে তো কে তা নির্ধারণ করে দিয়েছিলো?

(৪) আদি বস্তুতে বিস্ফোরণের পরে বা আদি বস্তুকণায় মহাবিস্ফোরণের পরে যে নিয়মাবলী বা প্রাকৃতিক বিধিবিধান অনুসরণে গ্যালাক্সি সমূহ গড়ে উঠলো, বিভিন্ন মৌলিক উপাদান, বস্তু ও শক্তি তৈরী হলো এবং অসংখ্য প্রাণহীন বস্তু ও প্রাণশীল প্রজাতি অস্তিত্বলাভ করলো; এ সব প্রাকৃতিক বিধিবিধান - যার সব এখনো আবিষ্কৃত হয় নি - কোত্থেকে এলো? এতো সব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক বিধি কোনো মহাবিজ্ঞানীর অস্তিত্ব ছাড়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব একটাই হতে পারে। তা হচ্ছে : এ জীবন ও জগতের অন্তরালে এমন এক অবস্তুগত সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান চিরন্তন মহাসত্তা রয়েছেন যিনি সকল কারণের আদি কারণ এবং সকল সৃষ্টির উৎস।

সর্বসাম্প্রতিককালে অনেক বিজ্ঞানী দাবী করেছেন যে, ক্বোয়ান্টাম্ ফ্লাকচুয়েশন বিধি অনুযায়ী ‘শূন্য’ (কিছুই না) থেকে বিশ্বজগতের সৃষ্টির সূচনা হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে তাঁরা দাবী করেন যে, সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই।

আসলে এ এক হাস্যকর উদ্ভট দাবী। যদিও ক্বোয়ান্টাম্ ফ্লাকচুয়েশন তত্ত্ব কোনো বিতর্কাতীত বিষয় নয় তথাপি এটিকে সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলাই শূন্য থেকে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং (কোরআন মজীদের উক্তি অনুযায়ী) তিনি অনবরত সৃষ্টি করে চলেছেন।

[বস্তুতঃ ক্বোয়ান্টাম্ ফ্লাক্চুয়েশন বিধি পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞত্ব পর্যায়ের একটি বিষয়, তাই তা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এ বিধি অনুযায়ী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শূন্য থেকে কোনো পরিমাণ এনার্জি তৈরী হতে পারে এবং তৈরী হওয়ার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ থেকে উপসংহার টানা হয়েছে যে, শূন্য থেকে একই সময় পার্টিকল্ ও এন্টি-পার্টিকল্ তৈরী হয় এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এন্টি-পার্টিকল্ পার্টিকলকে ধ্বংস করে দেয়। আসলে এর পিছনে এমন অজানা প্রাকৃতিক কারণ থাকাও অসম্ভব নয় যা বিজ্ঞানীরা এখনো আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা যেভাবে শূন্যস্থান দিয়ে মাধ্যম ছাড়া কীভাবে বিদ্যুত তরঙ্গ অতিক্রম করে এটা ব্যাখ্যা করতে না পেরে একটা অজানা মাধ্যম ধরে নিয়ে তার ‘ঈথার’ নামকরণ করেন, পার্টিকল্ ও এন্টি-পার্টিকল্ সৃষ্টি হওয়ার পিছনেও এমন কোনো অজানা উৎস থাকতে পারে - যা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আর সর্বোপরি, যে কারণে বা যে উৎস থেকেই তা উদ্ভূত হোক না কেন, অথবা শূন্য থেকে

উদ্‌ভূত হোক, তার পিছনে নিহিত আদি কারণ হচ্ছেন এক অনাদি-অনন্ত অপরিহার্য পরম জ্ঞানময় মহাসত্তা (আমাদের পরিভাষায় যার নাম আল্লাহ্)। নচেৎ আক্ষরিক অর্থে 'শূন্য' অর্থাৎ 'কিছুই না' থেকে কোনো 'কিছু' ই উদ্‌ভূত হতে পারে না।

অবশ্য স্বয়ং এ তত্ত্বটিতে মৌলিক দুর্বলতা আছে - যা নিয়ে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।]

এ ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় : সে সত্তা কোত্থেকে এলেন? তাঁকে কে সৃষ্টি করেছে? তাঁর স্বরূপ কী?

বস্তুতঃ এ ধরনের প্রশ্ন পুরোপুরি বিচারবুদ্ধিবিরুদ্ধ। কারণ, 'কারণ ও ফলশ্রুতি বিধি' এবং তার আওতাধীন জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি স্বয়ং কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাভুক্ত হতে পারেন না। যিনি অনাদি-অনন্ত বা চিরন্তন তাঁর সম্বন্ধে 'সৃষ্ট হওয়া' কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ, যিনি আদি স্রষ্টা তাঁর কোনো স্রষ্টা থাকতে পারে না; থাকলে তাঁর জন্য 'আদি স্রষ্টা' কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে না। তেমনি, বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, সসীম অসীমকে ধারণ করতে পারে না। তাই কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন সসীম সৃষ্টি মানুষের পক্ষে অসীম সত্তা সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বিচারবুদ্ধি যার অস্তিত্বমানতার পক্ষে রায় দেয় তাঁর স্বরূপ জানতে না পারার কারণে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা মূর্খতা মাত্র।

এবার আমরা, মানুষের বস্তুগত শরীর ছাড়াও তার মাঝে যে অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে বিচারবুদ্ধির আলোকে তার ওপর আলোকপাত করবো।

বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের চেয়েও আত্মা বা নাফ্স্-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা অধিকতর সহজ। আসলে শরীর জুড়ে এক বস্তুউর্ধ সত্তার অবস্থান যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ, প্রতিটি মানুষ নিজেই তা অনুভব করে।

প্রতিটি মানুষই স্বীয় ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে। এ অনুভূতি এমন একটি গুণ যা জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব নয়। (অবশ্য প্রতিটি বস্তুকণায়ই এক ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে; এটা এক ভিন্ন আলোচ্য বিষয় - যে সম্পর্কে আলোচনা করা এখানে অপরিহার্য নয়। এখানে আমরা সাধারণভাবে যাকে জড়বস্তু বলি এবং প্রাণের অনুভূতিহীন বলে অনুভব করি তার এবং প্রচলিত অর্থে প্রাণশীল এমন সৃষ্টি ও জড়বস্তুর মধ্যকার পার্থক্যকেই আত্মা, বা নাফ্স্ বা ব্যক্তিসত্তা বলে গণ্য করছি।)

ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-আনন্দ, হর্ষ-বিষাদ, সন্তোষ-ক্রোধ, আশা-ভয় ইত্যাদি অনুভূতি জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য নয়। তেমনি ন্যায়-অন্যায়বোধ, জ্ঞান ও মূর্খতা এবং সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিতর্ক জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য নয়। সহজাত প্রবণতা ও মেধা-প্রতিভার ধারণা জড়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য নয়।

বস্তুর একটি ধর্ম হচ্ছে একমুখিতা। অর্থাৎ বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবেই কোনো ফলাফল প্রদান করবে; সে ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ বা বিতর্ক সংক্রান্ত ধারণার কোনো স্থান নেই।

জড়বস্তুর উন্নততম সংস্করণ হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। কিন্তু সুপার কম্পিউটারে মানুষের গুণাবলী নেই। একটি সুপার কম্পিউটার কেবল সে সব কাজই করতে পারে যে সব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তার মধ্যে দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার মানুষের মতো নিজে নিজে কোনো কিছু উদ্ভাবন করার মতো শক্তির অধিকারী নয়, কল্পনা করতে সক্ষম নয়, স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলতে সক্ষম নয়। মানুষ নিজের সম্পর্কে, বিশ্বজগত সম্পর্কে এবং তার নিজের ও বিশ্বজগতের উৎস সম্বন্ধে চিন্তা করে; কোনো জড় বস্তু, এমনকি সুপার কম্পিউটারও তা করতে সক্ষম নয়। (বর্তমানে যে জৈবিক কম্পিউটার উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে তা আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কহীন। কারণ, তা স্রেফ্ জড়বস্তু নয়।)

মানুষ যে শুধু জড়বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নয়, বরং তার গোটা শরীর জুড়ে একটি অবস্তুগত অস্তিত্ব বিরাজমান - যা বস্তুগত শরীরকে পরিচালনা করে, তা প্রমাণের জন্য ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট বলে মনে করি। (এ অবস্তুগত সত্তা কীভাবে অস্তিত্বলাভ করে তা ভিন্ন একটি আলোচনার বিষয়; কিন্তু এ সত্তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।)

শরীর ও আত্মার সম্পর্ক

এ প্রসঙ্গে শরীর ও আত্মা (নাফ্স্)-এর সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

মানুষ হচ্ছে শরীর ও আত্মার সমন্বিত রূপ। শুধু শরীর বা শুধু আত্মাকে মানুষ বলা হয় না, বরং বলা হয় : 'মানুষের শরীর' ও 'মানুষের আত্মা' । কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানবসত্তায় আত্মার ভূমিকাই মুখ্য। আত্মা হচ্ছে শরীরের পরিচালক এবং শরীর হচ্ছে আত্মার বাহন ও হাতিয়ার স্বরূপ। তাই শরীর তার কর্মতৎপরতার জন্য পুরোপুরিভাবে আত্মার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আত্মা তার সকল কর্মতৎপরতার জন্য শরীরের ওপর নির্ভরশীল নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতে যার অস্তিত্ব নেই এমন কিছু সম্পর্কে, যেমন : আত্মা স্বয়ং তার নিজের সম্পর্কে এবং কাল্পনিক বিষয়াদি, দার্শনিক বিষয়াদি ও এ সব কিছুর উর্ধে খোদায়ী সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং সঠিক হোক বা ভুলই হোক, উপসংহারে উপনীত হতে ও জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম।

আত্মার আরো অনেক কর্মতৎপরতা আছে। আত্মা স্বীয় ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীতই অন্য আত্মার ওপর এবং বস্তুর ওপর (স্বীয় বা অন্যের শরীরের ওপর) প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একটি স্বতন্ত্র বিষয় - যার অবকাশ অত্র আলোচনার সীমিত পরিসরে নেই।

তবে এখানে উদাহরণস্বরূপ টেলিপ্যাথি, সম্মোহন (হিপনোটিজম্), স্বপ্ন, হতাশাব্যঞ্জক বা ভয়ানক খবর শুনে সুস্থ ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুবরণ ইত্যাদি এমন অনেক ধরনের আত্মিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলা যেতে পারে যা আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলের নিকটই স্বতঃপ্রমাণিত।

অতএব, এ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আত্মা তার কর্মতৎপরতার জন্য পুরোপুরি শরীরের ওপর নির্ভরশীল নয়।

শরীর জুড়ে অবস্থানকারী অবস্তুগত আত্মিক সত্তা কি শরীরেই সৃষ্টি হয়, নাকি শরীর সৃষ্টির এক বিশেষ পর্যায়ে তা বাইরে থেকে এসে শরীরে যুক্ত হয় তা এক স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আত্মিক সত্তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া কি অনিবার্য?

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে, আত্মিক সত্তা বাইরে থেকে এসে শরীরে যুক্ত হয়ে থাক অথবা শরীরেই তৈরী হয়ে থাক, শরীরের ধ্বংসের কারণে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অপরিহার্য নয়। কারণ, আমরা যখন নিদ্রিত থাকি তখন শরীর তথা শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা সক্রিয় থাকে বলেই আমরা স্বপ্ন দেখি। এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও আমাদের আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা চিন্তা ও কল্পনায় মশগূল্ হতে পারে। ব্যক্তিসত্তার সক্রিয়তা যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল নয় তখন পঞ্চেন্দ্রিয় বা শরীর ধ্বংস হলেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে - এটা সম্ভব বলে মনে করা যায় না।

এ ব্যাপারে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে পঙ্গু মানুষের ব্যক্তিসত্তা। কোনো ব্যক্তির শরীরের কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যদি কেটে ফেলা হয় তার ফলে তার ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস বা পঙ্গু হয়ে যায় না। কারো হাত বা পা কেটে ফেললে, বা চোখ তুলে ফেললে, বা কিডনি ফেলে দিয়ে তদস্থলে অন্যের কিডনি সংযোজন করলে, বা কৃত্রিম হৃদপিণ্ডসংযোজন করলে অথবা শরীরের অর্ধাংশ বা তার পেশী (শরীরের এক পাশ বা নিম্নাংশ) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অবশ হয়ে গেলে তার ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস বা অবশ হয়ে যায় না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া বা পক্ষাঘাত শরীরের আংশিক মৃত্যুতুল্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ব্যক্তিসত্তার আংশিক মৃত্যু ঘটে না তখন শরীর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও যে ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস হয় না - এ ব্যাপারে সুস্থ বিচারবুদ্ধি মোটেই সন্দেহ পোষণ করে না।

বস্তুতঃ শরীর থেকে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের অন্যতম কারণ হচ্ছে গোটা শরীরের প্রতিটি কোষ জুড়ে আত্মার অবস্থান। এ কারণেই অনেকে বুঝে উঠতে পারে না যে, শরীর ধ্বংস হয়ে গেলে এবং তার কোষগুলো পচেগলে বা ভস্মীভূত হয়ে প্রকৃতিতে মিশে গেলে তার আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস না হয়ে পারে কীভাবে।

বস্তুতঃ শরীর ও আত্মার ভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব হওয়ার প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার কারণেই এ ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সংশয় নিরসনের জন্য বিদ্যুত ও বিদ্যুতবাহী তারের উপমা দেয়া যেতে পারে। তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুত

প্রবাহিত হয় এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারের মধ্যে বিদ্যুত অবস্থান করে। কিন্তু বিদ্যুত তার ছাড়াও শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে (তরঙ্গ আকারে) প্রবাহিত হতে পারে (এবং যতোক্ষণ প্রবাহিত হয় ততোক্ষণ তা কোথাও না কোথাও অবস্থানও করে বটে)। আর তার ও বিদ্যুতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যতোখানি বস্তুগত শরীর ও তাতে বিরাজিত আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশী।

ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, শরীরের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অপরিহার্য নয়, বরং তার টিকে থাকাই অপরিহার্য। কারণ, মানবপ্রকৃতি এটাই দাবী করে।

মানুষমাত্রই অনন্তকাল টিকে থাকতে চায়। এই টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা মূলতঃ ব্যক্তিসত্তার টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা। এ কারণেই মানুষ বিকলাঙ্গ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েও বেঁচে থাকতে চায়। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি পুরোপুরি সংজ্ঞাহারা হয়ে যায় এবং তার সংজ্ঞা ফিরে পাবার আর কোনোই সম্ভাবনা না থাকে তথাপি তার স্বজনরা চায় যে, সে ঐ অবস্থায় হলেও বেঁচে থাক। শুধু তা-ই নয়, কোনো সুস্থ ব্যক্তির কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় যে, সে ঐ ধরনের অবস্থার শিকার হলে মৃত্যু বা ঐ ধরনের অবস্থায় বেঁচে থাকার মধ্যে কোনটিকে সে অগ্রাধিকার দেয়, তো সাধারণতঃ সে ঐ অবস্থায় হলেও বেঁচে

থাকাকে অগ্রাধিকার দেয়। ঐ অবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা তার শরীরকে আশ্রয় করে অবস্থান করে বিধায়ই স্বজনরা তার ব্যক্তিসত্তাকে তাদের কাছে রাখতে চায় বলে এবং স্বয়ং তার ব্যক্তিসত্তাও স্বজনদের কাছে থাকতে চায় বিধায় ঐ অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে রাখাকে বা ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে।

আমরা দেখতে পাই যে, শুধু মানুষের মধ্যে নয়, কম-বেশী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী যে কোনো প্রাণশীল সৃষ্টির মধ্যে যতো ধরনের কামনা-বাসনা রয়েছে তার সব কিছুই পূরণের ব্যবস্থা বা সম্ভাবনা প্রাকৃতিক জগতে নিহিত রয়েছে। এ ধরনের কোনো প্রাণীর এমন কোনো অভাববোধ নেই যা পূরণের আয়োজন বা উপকরণাদি বা সম্ভাবনা প্রকৃতির বুকে নিহিত রাখা হয় নি। ক্ষুধার জন্য খাদ্য, পিপাসার জন্য পানি, শোনার জন্য সুন্দর সুর, দেখার জন্য মনোরম দৃশ্য, ঘ্রাণ নেয়ার জন্য সুগন্ধি, স্পর্শ করার জন্য মোলায়েম বা পুলকসঞ্চারক বা আরামদায়ক উপায়-উপকরণ, উষ্ণতা ও শীতলতা, নারীর যৌন কামনা পূরণের জন্য পুরুষ ও পুরুষের যৌন কামনা পূরণের জন্য নারী ইত্যাদি প্রতিটি কামনা-বাসনা পূরণের জন্যই উপায়-উপকরণ বা সম্ভাবনা নিহিত রাখা হয়েছে। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে এমনকি মাছের মতো ডুবে থাকার, পাখীর মতো ওড়ার, শুধু তা-ই নয়, নক্ষত্রলোকে উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি সে সব সম্ভব হওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব কামনা করে, অথচ তা অমর হবে না, বরং শরীরের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ঘটবে - এটা হতেই পারে না; এটা কেউ ভাবতেই পারে না।

এমনকি যারা দাবী করে যে, শরীরের মৃত্যুর সাথে সাথেই ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস হয়ে যায় তাদেরও অবচেতন মনে ব্যক্তিসত্তার অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। শুধু আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং অবচেতন মনে তারাও ব্যক্তিসত্তার অমরত্বে প্রত্যয় পোষণ করে। এ কারণেই দেখা যায়, সারা জীবন সৃষ্টিকর্তা ও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এমন বস্তুবাদী নাস্তিক ব্যক্তিরাও মৃত্যুশয্যায় অস্থির ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে; মৃত্যুবরণ করতে ভয় পায়। কেন তাদের এ অস্থিরতা ও আতঙ্ক? কিসের ভয় তাদের? মৃত্যুতে ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি ঘটলে তো মৃত্যুতে ভয়ের কিছুই নেই। বরং সুখ-দুঃখের পৃথিবীতে বেঁচে থেকে সুখের লোভে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাজনিত দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়াবার চেয়ে মরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই তো উত্তম।

আসলে মুখে অস্বীকার করলেও সচেতনভাবে বা অবচেতন মনে তারা আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার অমরত্বে প্রত্যয় পোষণ করে। এ কারণেই, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক অজানা নতুন জগতে প্রবেশ করতে তারা ভয় পায়। কারণ, যে কোনো নতুন ও অজানা জায়গায় ও পরিবেশে প্রবেশ করতে গিয়ে ভয় পাওয়া মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তারা ভয় পায়।

বস্তুতঃ শুধু মরতে না চাওয়ার মধ্যে নয়, এমনকি মরতে চাওয়ার মধ্যেও আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার অমরত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

মানুষ কখন আত্মহত্যা করে? যখন সে কারো কাছ থেকে বা কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে বাঁচতে চায় তখন সে আত্মহত্যা করে। যেহেতু সশরীরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমষ্টি, অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয় সেহেতু আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা আত্মহত্যা করে দেহের কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কষ্টদায়ক ব্যক্তি বা সমষ্টির ধরাছোঁয়ার বাইরে বা বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির বাইরে পালিয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ সে তার ব্যক্তিসত্তাকে শরীর থেকে স্বতন্ত্র ও অমর গণ্য করে বলেই আত্মহত্যা করে, যদিও সে সব সময় এ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে ‘আলামে বারযাখ্

সর্বজনীনভাবে মানবপ্রজাতির অনুভূতি মৃত ব্যক্তিদের আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার সচেতন উপস্থিতির সপক্ষে রায় দেয়, অচেতন বা ঘুমন্ত অবস্থার সপক্ষে রায় দেয় না। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলেই সদ্যমৃত ব্যক্তি সম্পর্কে অনুভব করে যে, যেন সে আশেপাশেই আছে, যেন সব কিছু দেখছে ও শুনছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না অর্থাৎ জীবিতদের শোনার মতো করে কথা বলতে পারছে না।

এমনকি নাস্তিক লোকেরা পর্যন্ত তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখায় এবং তাদের স্মৃতির প্রতি ঠিক সেভাবেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে যেভাবে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতো তাদের জীবদ্দশায়; তাদের চেতনার অসম্মান হোক এটা তারা কিছুতেই মানতে পারে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রায় সকলেই আন্তরিক। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত থাকাকালে যাদের সাথে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো তার মৃত্যুর পরেও তারা তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা অনুভব করে। কিন্তু যে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তথা অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা পোষণের তো কোনোই অর্থ হয় না। আসলে তারা অবচেতনভাবে হলেও মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব ও কাছাকাছি উপস্থিতির প্রত্যয় পোষণ করে। অন্যদিকে

যারা আস্তিক, ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলেই সচেতনভাবেই এ প্রত্যয় পোষণ করে থাকে।

মানুষ সাধারণতঃ এমন কিছু করতে চায় না তার মৃত স্বজন বেঁচে থাকলে যা অপসন্দ করতো। তারা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে পর্যবেক্ষণক্ষমতাসহ উপস্থিত অনুভব করে বলেই এরূপ আচরণ করে থাকে। মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তাকে বিলুপ্ত বা ঘুমন্ত মনে করলে তারা কখনোই এরূপ আচরণ করতো না, কারণ, সে ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ হতো অযৌক্তিক ও অর্থহীন। মৃত ব্যক্তিদের দেহভস্ম সসম্মানে সংরক্ষণ অথবা তাদের ক্কবরে বা তাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের কাছে বা তাদের মমিকৃত মৃতদেহের সামনে গিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের পিছনেও তাদের একই অনুভূতি কাজ করে থাকে।

মানবপ্রকৃতির আরেকটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সে প্রিয় স্বজনদের কাছাকাছি থাকতে চায়, প্রয়োজনে দূরে কোথাও গেলেও যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাছে ফিরে আসতে চায় এবং নিয়মিত পরস্পরের খোঁজখবর জানতে চায়। তাই মৃত্যুর পরেও প্রিয় স্বজনদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার চিন্তা তাদের মধ্যে হতাশা ও বিমর্ষতার সৃষ্টি করে। তাই সকলেই সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে এ আশাই পোষণ করে যে, মৃত্যুর পরেও সে প্রিয় স্বজনদের কাছাকাছি থাকবে। নিজ বাড়ীতে বা বাড়ীর যথাসম্ভব কাছাকাছি প্রিয় স্বজনদের ক্কবরের পাশে ক্কবর দেয়ার জন্য ওয়াছ্বীয়াত্ করে

যাবার পিছনেও একই অনুভূতির প্রভাব বিদ্যমান। নয়তো মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে বলে ধারণা পোষণ করলে মৃত ব্যক্তির বা তার জীবিত প্রিয় স্বজনদের কারো কাছেই এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনোই মূল্য হতে পারে না।

মানবপ্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সে দীর্ঘ ঘুম পসন্দ করে না - না তার নিজের জন্য, না তার প্রিয় স্বজনদের জন্য। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা হাজার হাজার বা কোটি কোটি বছর ঘুমিয়ে থাকবে এটা নিজের বা প্রিয়জনদের জন্য চিন্তা করতেই মানুষ বিষণ্ন ও বিমর্ষ হতে বাধ্য। তাই তারা মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার জাগ্রত অবস্থাই কামনা করে।

মানবপ্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সে তার নিজের ভালো কাজের পুরষ্কার ও তার শত্রুর বা তাকে কষ্টদানকারীর জোর-যুলুম ও মন্দ কাজের শাস্তির ব্যাপারে অতি বিলম্ব পসন্দ করে না। অবশ্য সে নিজের পুরষ্কার ও প্রতিপক্ষের শাস্তির ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা অপরিহার্য লক্ষ্য করলে সে ক্ষেত্রেও যথাসময়ের পূর্বে ভালো ও মন্দ কাজের কিছু না কিছু প্রভাব আশা করে। উদাহরণস্বরূপ, যাকে পুরষ্কার দেয়া হবে তাকে নির্ধারিত অনুষ্ঠানের আগেই অনুষ্ঠানস্থলে এলে সেখানেই বা তার কাছাকাছি কোনো ভালো ও আরামদায়ক অবস্থানস্থলে সাদরে বিশ্রাম নিতে দেয়া হয় এবং হাল্কাভাবে হলেও আদর-আপ্যায়ন করা হয়। তেমনি বিবাহ বা অন্যবিধ আনন্দ-অনুষ্ঠানেও মেহমানদেরকে মূল ভোজনপর্বের আগেই অনুষ্ঠানস্থলে বা কাছাকাছি অন্য কোনো উত্তম পরিবেশে বিশ্রাম ও আরাম

করতে দেয়া হয় এবং হাল্কাভাবে হলেও, আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন করা হয়। বস্তুতঃ সকলে এটাই আশা করে। অন্যদিকে একজন সন্দেহাতীত ফৌজদারী অপরাধীকে গ্রেফতারের পর থেকে বিচার শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত এমন অবস্থায় রাখা ও আনা-নেয়া করা হয় যাকে শাস্তি বলা না গেলেও তা মোটেই আরামদায়ক বা সম্মানজনক নয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় - যা এক ধরনের মানসিক শাস্তি বটে। আর সাধারণভাবে লোকেরা এটাই পসন্দ ও আশা করে।

তাছাড়া শাস্তি ও পুরষ্কার উভয়ই যদি হাজার হাজার বছর, এমনকি কোটি কোটি বছর দূরবর্তী হয়; তার ছিটেফোঁটাও যদি আশুপ্রাপ্তি না ঘটে, বরং হাজার হাজার বছর, এমনকি কোটি কোটি বছর যদি ভালো ও মন্দ উভয় ব্যক্তিকে পাশাপাশি অভিন্ন অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় তাহলে মানবমনে তা অন্যায় বলে প্রতিভাত হয় এবং তা মানুষের মনে ও আচরণে হতাশা সহ বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য। কারণ, অতি বিলম্বিত পুরষ্কারের প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং অতি বিলম্বিত শাস্তির প্রতি ভীতিও হ্রাস পায়।

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মানবপ্রকৃতিতে যতো প্রয়োজন ও কামনা-বাসনা নিহিত রাখা হয়েছে তার সবই পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই সর্বজনীনভাবে যেহেতু মানবপ্রকৃতি তার ব্যক্তিসত্তার অমরত্ব এবং সচেতন জাগ্রত অবস্থা, স্বীয় সৎকর্মের পুরো পুরষ্কার প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলেও

অবিলম্বে অন্ততঃ কিছুটা সম্মান-আপ্যায়ন এবং অপরাধীর বিচার ও পুরো শাস্তিতে বিলম্ব হলেও তার জন্য অবিলম্বে অন্ততঃ অপসন্দনীয় অবস্থা দাবী করে, তখন এমনটি হওয়াই অপরিহার্য। অন্যথায় সৃষ্টিকর্তা মানবপ্রকৃতিতে এ ধরনের কামনা-বাসনা প্রদান করতেন না।

দেহবিহীন আত্মার অনুভূতিশক্তি

এরপরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মৃত্যুর পরে দেহবিহীন আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার অনুভূতিশক্তি থাকবে কিনা? এ প্রশ্নের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় আমরা দেহের মাধ্যমে তথা দৈহিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে বাইরের জগত সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ করি এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতি অর্জন করি। দুনিয়ার বুকে আনন্দভোগ ও শাস্তিভোগ উভয়ই দেহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্যদিকে শেষ বিচারের জন্য দেহসহ পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এবং দেহসহই ব্যক্তিকে পুরষ্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। ধর্মীয় সূত্রও এটাই বলে এবং বিচারবুদ্ধিও এটাই দাবী করে। এমতাবস্থায় দেহবিহীন আত্মার সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্ভাবনা কতোখানি?

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, পার্থিব জীবনেও মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই আনন্দ ও বেদনার অনেক অনুভূতি অর্জন করে থাকে। আর ক্ষেত্রবিশেষে তা দৈহিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে অর্জিত অনুভূতির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। একজন মানুষকে প্রকাশ্য রাস্তায় অসম্মানজনক কথা বললে বা গালি দিলে ক্ষেত্রবিশেষে তা বেত্রাঘাত বা ছুরিকাঘাতের চেয়েও অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে।

অবশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে তা-ও গুরুত্বহীন নয়। এ কারণেই পুনরুত্থান সংঘটিত হবে পার্থিব জীবনের ন্যায় দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে এবং বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী এমনটিই হওয়া

উচিত। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জন্য অপরিহার্য নয়।) তবে পার্থিব জীবনে দেহ কেবল ব্যক্তিসত্তাকে অনুভূতি অর্জনে সহায়তাই করে না, বরং অনুভূতিঅর্জনক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে। কারণ, পার্থিব জীবনে ব্যক্তিসত্তার মনোযোগের একটি বিরাট অংশ, বরং সিংহভাগই তার দেহের প্রতি নিবদ্ধ থাকে - যাতে দেহ কোনো ভুল কাজ না করে, ভুলবশতঃ নিজের ক্ষতি না করে এবং বিপদে না পড়ে। ফলে জাগ্রত অবস্থায় অন্যান্য ক্ষেত্রে আত্মার বিচরণ ও অনুভূতি তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ থাকে।

এছাড়া দেহের দুর্বলতা ও ক্লান্তি-শ্রান্তির কারণে ব্যক্তির জন্য ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা অবস্তুগত বিধায় তার ক্ষয়, দুর্বলতা ও ক্লান্তি-শ্রান্তি থাকতে পারে না, ফলে তার ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন থাকতে পারে না। তেমনি জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় দেহের প্রতি আত্মার যে সিংহভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে মৃত্যুর পরে তার আর প্রয়োজন না থাকায় আত্মার অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর থাকে এবং তার তৎপরতার ক্ষেত্র হয় ব্যাপকবিস্তৃত। এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য মৃত্যুর পর ব্যক্তির আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ফেরেশেতাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি জগতে সীমাবদ্ধতার আওতায় আসে। তবে এটা একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়।

মোদ্দা কথা, মৃত্যুর ফলে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার ভালো-মন্দের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা তার সকল প্রকার কর্মতৎপরতা অসম্ভব হয়ে পড়বে - বিচারবুদ্ধি এটা মানতে পারে না।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, দেহযন্ত্র অচল হয়ে পড়ায় আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার কর্মতৎপরতার আওতা সীমিত হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু তার অনুভূতি না থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ, জীবদ্দশায় শরীরের যে অনুভূতি তা আসলে শরীরযন্ত্রের মাধ্যমে আত্মার অর্জিত অনুভূতি বৈ নয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পরেও যদি আত্মা টিকে থাকে (এবং আসলেই টিকে থাকে) তাহলে তার সুখ-দুঃখের উর্ধে ওঠার ধারণার পিছনে কোনোই যৌক্তিকতা নেই।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের আত্মা অতীতের ভালো ও সুখকর স্মৃতির কথা স্মরণ করে আনন্দিত হয়, ভবিষ্যতের শুভ সম্ভাবনার কথা ভেবে আশান্বিত হয়ে ওঠে, অতীতের তিক্ত স্মৃতি বা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খারাপ পরিণতি আনয়নকারী অতীত ভুলভ্রান্তি এবং ভবিষ্যতের অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে হতাশ, ব্যথিত ও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের আনন্দের অনুভূতি এমন চরমে উপনীত হতে পারে যে, এর আতিশয্যে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তেমনি ভবিষ্যত বিপদাশঙ্কাও এমন হতে পারে যে, তা তার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। অন্যদিকে ভবিষ্যত দুঃখকষ্টের দুঃসহতার কথা চিন্তা করে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় আত্মহত্যার পথও

বেছে নিতে দেখা যায়। যুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতিত হবার ভয়ে আহত সৈনিকের আত্মহত্যার ঘটনার কথাও অনেক শোনা যায়।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, আত্মা কেবল অতীত ও ভবিষ্যতের ভালো-মন্দের কারণেও বর্তমানে সুখ বা দুঃখ অনুভব করতে পারে। আর বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের সুখ ও দুঃখ বস্তুগত বা দৈহিক নয়, বরং পুরোপুরি আত্মিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় মৃত্যুর তথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ব্যক্তির আত্মা অতীতের ভালো-মন্দ আমল এবং ভবিষ্যতের পুরষ্কার ও শাস্তির কথা চিন্তা করে আনন্দিত বা যন্ত্রণাকাতর ও অনুতপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

অবশ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার আত্মা বস্তুগত দেহের অধিকারী না থাকায় শারীরিক তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয় না। তেমনি সুচিন্তা ও অনুতাপ সহ যে সব আত্মিক কর্ম দুনিয়ার বুকে আঞ্জাম দিলে তা থেকে শেষ বিচারে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতো মৃত্যুর পরে সে সব কাজ আঞ্জাম দিলে শেষ বিচারে লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুপরবর্তী জগতে ব্যক্তির আত্মিক তৎপরতা ও আত্মিক অনুভূতি বন্ধ হয়ে যাবে - তার কোনোই কারণ নেই। তবে আত্মা দুনিয়ার বুকে যে সব আত্মিক তৎপরতা চালায় মৃত্যুর পরে তার কতোখানি চালাতে পারে বা কতোখানি চালাবার স্বাধীনতা লাভ করে এবং কোন্ ধরনের ব্যক্তিদের আত্মা স্বাধীনতা লাভ করে এবং যারা তা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কে কতোখানি স্বাধীনতা লাভ করেন তা এক ভিন্ন বিষয়। এ সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি কিছুটা ধারণায় উপনীত হতে পারলেও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভে সক্ষম নয়। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার

আত্মার সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এক অনস্বীকার্য ব্যাপার।

বিষয়টি একটি পার্থিব দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝার জন্য চেষ্টা করলে বুঝতে পারা সহজ হতে পারে। যেমন : ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়ার পর যখন ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন যারা খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে তারা তাদের অতীতের ভুলের জন্য মনস্তাপে ভুগতে থাকে এবং ফলাফল ঘোষণার পরে সম্ভাব্য অকৃতকার্যতা তার জন্য যে নিন্দা ও ধিক্কার ডেকে আনবে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা তার মধ্যে চরম যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যদিকে যে ছাত্র ভালো পরীক্ষা দিয়েছে সে তার এ পরীক্ষার কারণে মানসিক প্রশান্তির অধিকারী থাকে এবং ভবিষ্যত শুভ ফলাফলের চিন্তা তার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। শুধু তা-ই নয়, ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও যারা এ দু'জন ছাত্রের পড়াশুনা ও পরীক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবগত তারা খারাপ ছাত্রটির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে সমাদর করে না, অন্যদিকে সকলেই ভালো ছাত্রটির প্রতি স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে তাকায় ও তাকে খাতির করে, সমাদর করে। এ দুই বিপরীত আচরণও দুই ছাত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনুভূতির সৃষ্টি করে থাকে। মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে শুরু করে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আত্মার অবস্থা এ অবস্থার সাথে তুলনীয়।

মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধি মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী সময়ে আত্মার অনুভূতি, সুখ-দুঃখ এবং তার ওপরে অতীত-ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়াকে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে গণ্য করে।

আলামে বারযাখ্ কোথায়?

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে 'আলামে বারযাখ্ বা মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগত সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে : এ জগত কোথায় অবস্থিত?

নিঃসন্দেহে এ জগতের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অকাট্যভাবে জানা বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি এর অবস্থান সম্পর্কে যেমন বিচারবুদ্ধির দাবী থাকতে পারে, তেমনি বিচারবুদ্ধি এ সংক্রান্ত কোনো কোনো সমস্যা উপস্থাপন করতে ও তার সম্ভাব্য জবাব প্রদান করতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে যেমন আলোচনা করেছি, বিচারবুদ্ধি মৃত প্রিয়জনদের আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা ও জীবিত প্রিয়জনদের মধ্যে নৈকট্য কামনা করে এবং এ কারণেই মৃতদের ব্যক্তিসত্তার ঘুমন্ত অবস্থা পসন্দ করে না, বরং জাগ্রত অবস্থা পসন্দ করে। অতএব, এ নৈকট্যের দাবী অনুযায়ী মৃতদের ব্যক্তিসত্তার জীবিতদের কাছাকাছি অবস্থানই কাম্য। অবশ্য কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা 'আলামে বারযাখে কতোখানি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ও জীবিত প্রিয়জনদের কাছাকাছি আসতে পারবে অথবা আদৌ সে সুযোগ পাবে কিনা তা স্বতন্ত্র বিষয়; বিচারবুদ্ধি এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে ও নিশ্চিতভাবে মতামত

ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, বিচারবুদ্ধি মৃতদের ব্যক্তিসত্তার জীবিতদের কাছাকাছি অবস্থান কামনা করে। অতএব, বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী, 'আলামে বারযাখ্ এই পৃথিবীর বুকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর পরিবর্তে দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রলোকে বা অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে 'আলামে বারযাখের অবস্থান হলে মানবমন প্রিয়জনদের ব্যক্তিসত্তার সুদূর লোকে অবস্থানজনিত বিষাদ অনুভব করতে বাধ্য। তাই এটা কাম্য নয়। বিশেষ করে 'আলামে বারযাখের অবস্থান এ পৃথিবীর বুকে হতে যখন কোনো বাধা নেই এমতাবস্থায় তা দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রলোকে বা গ্যালাক্সিতে তা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তবে বিচারবুদ্ধি 'আলামে বারযাখের অনিবার্যভাবে মাটির নীচে হওয়াকেও মানতে পারে না। কারণ, এমন অনেক মানুষ আছে যাদের মৃতদেহকে মাটির নীচে ক্বর দেয়া হয় না, বরং পুড়িয়ে ফেলা হয়, বা শীতল গৃহে সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া অনেক লোক বন্যজন্তুর বা সামুদ্রিক প্রাণীর পেটে গিয়েছে এবং অনেকের শরীর পচেগলে পানিতে মিশে গিয়েছে; তাদের জন্য মাটির ক্বরের প্রশ্ন আসে না। তাই শরীরবিহীন ব্যক্তিসত্তার জন্য 'আলামে বারযাখ্ কোথায় হবে তার সাথে তার মৃতদেহ কোথায় আছে তার সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য নয়। সুতরাং 'আলামে বারযাখ্ যেমন এ পৃথিবীর বুকে হওয়া কাম্য তেমনি তা মাটির নীচে না হয়ে মাটির ওপরে হওয়াও কাম্য। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে তা খুবই সহজসাধ্য। অবশ্য অধিকতর সঠিকভাবে বললে

বলতে হয়, যেহেতু ‘আলামে বারযাখ্ একটি ভিন্ন মাত্রার অবস্তুগত জগত সেহেতু তার জন্য মাটির ওপর-নীচ ও এতদুভয়ের কোনো কিছুই বাধা নয়, বরং তার ক্ষেত্রে মাটির ওপর-নীচ কথাটা আদৌ প্রযোজ্য নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ‘আলামে বারযাখ্ যদি এ পৃথিবীর বুকেই থেকে থাকে তাহলে আমরা কেন মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তাকে ও সে জগতের নিদর্শনাদি দেখতে পাই না? তাছাড়া যে সব জনাকীর্ণ জনপদে মানুষ ব্যাপকভাবে বিচরণশীল ও কর্মতৎপর সে সব জায়গায় আরেকটি জগতের অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব?

এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ‘আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার জগত। তাই তা এক ভিন্ন মাত্রার (Dimension) জগত। এ কারণে একদিকে যেমন সে জগত আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ের ধারণক্ষমতার বাইরে অন্যদিকে একই কারণে বস্তুজগতের সাথে সে জগতের সাংঘর্ষিকতার প্রশ্ন আসে না।

এমনকি আমাদের পার্থিব জগতেও অভিন্ন স্থান-কালে কোনোরূপ সাংঘর্ষিকতা ব্যতীতই একাধিক অস্তিত্বের অবস্থানের দৃষ্টান্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচ, বায়ু ও পানির মধ্য দিয়ে আলো অবাধে যাতায়াত করে এবং যাতায়াতকালে খুবই অল্প সময়ের জন্য হলেও (সেকেণ্ডের ক্ষুদ্রাংশের জন্য হলেও) এ সবের মধ্যে অবস্থান করে (যদিও স্থির অবস্থান নয়, বরং গতিশীল অবস্থায় অবস্থান, তবে অবস্থান করে অবশ্যই)। কিন্তু ঐ সব বস্তুর ভিতরে আলোর অবস্থান বা

ওগুলোর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য ওগুলোকে অপসারণ করার প্রয়োজন হয় না।

একইভাবে, বিদ্যুত ধাতব পদার্থ, মাটি ও পানির মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং বিদ্যুততরঙ্গ এতদসহ সব কিছুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে; এ জন্য কোনো কিছুকে অপসারণ করতে হয় না। চৌম্বক ক্ষেত্রও কোনো কিছু অপসারণ না করে অবস্থান করে। সর্বোপরি আমাদের দেহ জুড়ে যে আত্মার অবস্থান তা-ও বস্তুদেহের কোনো অংশকে অপসারণ না করেই অবস্থান করে। অতএব, এতে সন্দেহের কোনোই কারণ নেই যে, 'আলামে বারযাখ্ ভিন্ন মাত্রার জগত হবার কারণে এ বস্তুজগতের কোনো কিছুর অবস্থানকে বাধাগ্রস্ত না করেই এখানে অবস্থিত হতে পারে। আর ভিন্ন মাত্রার জগত হবার কারণেই আমরা আমাদের বস্তুদেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা 'আলামে বারযাখের অস্তিত্ব ও সে জগতের ঘটনাবলী অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছি না।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতেও অনেক কিছু বস্তুদেহের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে ব্যর্থ হই। বায়ু পুরোপুরি অদৃশ্য এবং পূর্ণ স্বচ্ছ কাঁচ ও পানি প্রায় অদৃশ্য। অবশ্য এগুলোকে আমরা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটি দ্বারাই আলো-কে সরাসরি অনুভব করতে পারি না; কেবল কোনো বস্তুতে আলো পতিত হলে তা দেখা যাওয়ার কারণে আমরা আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারি। বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও অনুরূপ; আমরা এতদুভয়ের অস্তিত্ব

কেবল উভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝতে পারি। অন্যদিকে রঞ্জন রশ্মি ও অতি লাল রশ্মি সহ এমন কতক রশ্মি আছে যা বায়ু, কাঁচ ও পানি ছাড়াও অন্যান্য স্থূল বস্তুকে - আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার সাধারণ অলোকরশ্মি যেগুলোকে ভেদ করতে পারে না - ভেদ করে চলে যায় বিধায় সাধারণ আলোকরশ্মির মতো তা বস্তুতে পতিত হবার পর প্রতিফলিত হয় না, ফলে সাধাণভাবে আমরা ঐ সব রশ্মির অস্তিত্ব সরাসরি ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা পরোক্ষভাবেও অনুভব করি না; কেবল বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যেই এ ধরনের আলোর প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে। অথচ সংশ্লিষ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার আগেও এ ধরনের রশ্মির অস্তিত্ব ছিলো এবং তা বস্তুর ওপরে পতিত হয়ে তা ভেদ করে চলে যেতো, কিন্তু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা না এ সব রশ্মির অস্তিত্ব বুঝতে পারতাম, না এ সবের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারতাম।

অতএব, 'আলামে বারযাখের অস্তিত্ব এ পৃথিবীর বুকে হওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করার কারণ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'আলামে বারযাখ্ আমাদের এ পৃথিবীতে হওয়ার মানে এ নয় যে, এ জগতের অস্তিত্ব এবং মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার অবস্থান ও বিচরণ কেবল মাটির ওপরে মানুষের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে। বরং আসমান-যমীনের সর্বত্রই এ জগতের আওতাভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, বস্তুদেহের যে সীমাবদ্ধতা আছে আত্মার জন্য সে ধরনের বস্তুগত সীমাবদ্ধতা থাকার প্রশ্ন আসে না যদি না সে জগতের পরিচালনাব্যবস্থার আওতায় বিশেষভাবে

কারো ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। অন্যদিকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন রঞ্জন রশ্মি ও অতি লাল রশ্মির প্রতিক্রিয়া ধরা সম্ভব হচ্ছে তেমনি শক্তিশালী ব্যক্তিসত্তার অধিকারী জীবিত মানুষের পক্ষে 'আলামে বারযাখের অবস্থা অবহিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। এটাই বিচারবুদ্ধির রায়।

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ‘আলামে বারযাখ্

বারযাখ্ ও ‘আলামে বারযাখ্

মৃত্যুপরবর্তী ও পুনরুত্থানপূর্ববর্তী সময়ে মানুষের আত্মা বা নাফ্স্ (ব্যক্তিসত্তা) যে অবস্থায় থাকে ইসলামী ‘আক্বাএদের বিশেষজ্ঞগণ একে ‘আলামে বারযাখ্ নামকরণ করেছেন। বাংলা ভাষায় আমরা একে ‘অন্তর্বর্তী জগত’ বা ‘অন্তর্বর্তীকালীন জগত’ এবং ইংরেজীতে Intermediate World বলতে পারি।

বারযাখ্ (برزخ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘বাধা’ , বা ‘অন্তরায়’ । কোরআন মজীদের সূরাহ্ আর্-রাহমান্-এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল্ ‘আলামীন্ এরশাদ করেন :

(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ)

“তিনি পরস্পরমিলিত দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন; (কিন্তু) এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে (এমন এক) অন্তরায় (বারযাখ্) এতদুভয় যা অতিক্রম করতে পারে না।” (১৯-২০)

এখানে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জন্য অপরিহার্য নয়। কারণ, যেখানেই দু’টি সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে সেখানে উভয় সমুদ্রের পানি স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করছে এবং কোনো তৃতীয় মিশ্রিত রূপ ধারণ করছে না। বিশেষ করে যেখানে দু’টি সমুদ্রের একটি মিঠা পানির ও একটি লোনা পানির এবং উভয়টির

পানির রঙে পার্থক্য আছে সেখানে এ অবস্থাটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

তবে এখানে "বারযাখ্" শব্দের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে, এ অন্তরায় কোনো কঠিন বস্তুর অন্তরায় নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নদীর ওপর বাঁধ দিলে তার দুই অংশের মধ্যে যে ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি হয় এখানে তদ্রূপ কোনো অন্তরায়ের কথা বলা হয় নি। বরং এ অন্তরায় হচ্ছে সৃষ্টিপ্রকৃতিগত অন্তরায়, যেমন : তেল আর পানি উভয়ই তরল পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে পরস্পর মিশ্রিত হয় না।

কোরআন মজীদে সরাসরি, মিঠা পানি ও লোনা পানির সমুদ্রের পরস্পর মিশ্রিত না হওয়ার পিছনে নিহিত কারণকেও "বারযাখ্" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا)

"তিনিই (আল্লাহ্) যিনি পরস্পরমিলিত দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন; (এতদুভয়ের মধ্যে) এটি সুমিষ্ট তৃষ্ণানিবারক ও এটি লোনা বিস্বাদ। আর তিনি এতদুভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় (বারযাখ্) ও অনতিক্রম্য অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্ : ৫৩)

আর 'আালামে বারযাখ্ হচ্ছে পার্থিব জগত ও পুনরুত্থানপরবর্তী জগতের মাঝখানে উভয় থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি জগত। এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'আালামে বারযাখ্।

কোরআন মজীদে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তারা যথাযথ আমল করার জন্য পুনরায় তাদেরকে পার্থিব জীবনে ফেরত পাঠানোর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে তাদের পক্ষে আর পার্থিব জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। কারণ, এরশাদ হয়েছে :

(وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)

"আর পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাদের পশ্চাতে রয়েছে এক অন্তরায় (বারযাখ্)।" (সূরাহ্ আল্-মু' মিনূন্ : ১০০)

অর্থাৎ পার্থিব জগত ও পুনরুত্থানপরবর্তী জগতের মাঝখানে একটি অন্তরায় রয়েছে যা তাদেরকে পার্থিব জগতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে না, বরং তাদেরকে পুনরুত্থান দিবসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ থেকেই এ অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থাকে ‘আালামে বারযাখ্ নামকরণ করা হয়েছে।

আালামে বারযাখ্ : জাগ্রত জগত

আালামে বারযাখ্ যে ঘুমন্ত জগত নয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা সেখানে তার বস্তুদেহের ন্যায় মৃত নয় তা কোরআন মজীদ থেকেই জানা যায়। এরশাদ হয়েছে :

(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় তাকে মৃত বলো না। বরং সে জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারো না।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৫৪)

কিন্তু আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিদেরকে যে জীবিত বলা হয়েছে তা কেবল সম্মানার্থে নয়। কারণ, মৃত্যুর পরে ও পুনরুত্থানের পূর্বে ব্যক্তিদের পার্থিব জীবনের কর্মের ভিত্তিতে কম-বেশী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে - যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পুরস্কার ও শাস্তি শুধু ভালো-মন্দের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়। বরং সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনাগত দিকের বিচারেই ভালো ও মন্দ লোকের প্রতীক্ষাকালীন পরিবেশ ভিন্ন হতে বাধ্য। বিশেষ করে যারা পার্থিব জীবনে যথাযথ আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রসর তাঁদের জন্য প্রতীক্ষাকালে অর্থাৎ 'আলামে বারযাখে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ নে 'আমতের ব্যবস্থা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কোরআন মজীদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের রবের সামনে জীবিত; তারা রিয্ক্ব্প্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা প্রদান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং

তাদের পিছনে যারা রয়ে গেছে ও এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি তাদের জন্য তারা আনন্দ উদযাপন করে - এ কারণে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান্ : ১৬৯-১৭০)

এখানে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিগণ (প্রচলিত পরিভাষায় যাদেরকে 'শহীদ' বলা হয়) আলমে বারযাখে রিয্ক্ব্ লাভ করে থাকেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন।

অন্য এক আয়াতে, দ্বীনের দাও 'আত্ প্রদান করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে এরশাদ হয়েছে :

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ)

"তাকে বলা হলো : বেহেশতে প্রবেশ করো। তখন সে বললো : হায়! আমার ক্বওম্ যদি জানতে পারতো যে, কীসের জন্য আমার রব্ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!" (সূরাহ্ ইয়া-সীন : ২৬-২৭)

কেউ কেউ মনে করেন যে, এটা শেষ বিচার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শেষ বিচারের ফয়ছ্বালা অনুযায়ী যারা বেহেশতবাসী ও যারা দোযখবাসী হবে তাদের সকলেরই পরস্পরের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ জানা থাকবে - জানা থাকবে যে, কেন আল্লাহ্ কাউকে ক্ষমা করবেন ও কেন আরেক জনকে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং কারো সৌভাগ্য সম্পর্কে তার ক্বওমের জানা না থাকার কারণে

সেখানে কারো আফসোস্ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া শেষ বিচারের দিনে বা তার ফয়ছ্বালার পরে কেউ কোনো নাফরমানের গোমরাহী ও দুর্ভাগ্যের জন্য চিন্তা করবে না, বা আফসোস্ করবে না। বিশেষতঃ হাশরের ময়দানে উত্থিত হবার সাথে সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ও পারস্পরিক দরদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এ জন্য কোনোই অনুভূতি থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ চূড়ান্ত ফয়ছ্বালার পরে আফসোস পুরোপুরি অর্থহীন; আর বেহেশতবাসীরা এ কাজ করতে পারেন না। কারণ, সাধারণতঃ আফসোসের সাথে জড়িত থাকে সংশোধনের আশা অর্থাৎ তারা যদি জানতে পারতো তাহলে নিজেদেরকে সংশোধন করতো। (অবশ্য দোযখবাসীরা নিজেদের অতীত কর্মের জন্য আফসোস্ করবে।)

সুতরাং, এটা যে 'আলামে বারযাখের বিষয় - যেখানকার অবস্থা সম্পর্কে জীবিত লোকদের জানা থাকে না, তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত আয়াত দু'টির পরবর্তী দুই আয়াত থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। কারণ, পরবর্তী দুই আয়াতে (২৮-২৯) 'তাঁর পরে তাঁর ক্বওমকে বজ্রাঘাতের দ্বারা' হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে যখন বেহেশতে প্রবেশ করতে বলা হয় এবং তিনি তাঁর ক্বওমের লোকদের জন্য আফসোস করেন তখন তাঁর ক্বওমের লোকেরা দুনিয়ার বুকে বেঁচে ছিলো।

আল্লাহর রাস্তায় নিহতদের চেয়ে অগ্রবর্তী যারা

এখানে উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিগণ অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং তাঁরা হচ্ছেন অগ্রবর্তীদের অব্যবহিত পরবর্তী দল। কারণ, এরশাদ হয়েছে :

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)

"আর যারাই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের ওপর আল্লাহ্ নে 'আমত বর্ষণ করেছেন; তারা (নে 'আমতপ্রাপ্তগণ) হচ্ছে নবীগণ, ছ্বিদ্দীক্বগণ, শহীদগণ ও ছ্বালেহ্গণ এবং বন্ধু হিসেবে তারাই উত্তম।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৬৯)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার নে 'আমতপ্রাপ্ত হচ্ছেন চার দল এবং আমরা প্রতি রাক্ 'আত্ নামাযে (সূরাহ্ ফাতেহায়) আমাদেরকে যে নে 'আমতপ্রাপ্তদের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন জানাই তাঁরা হচ্ছেন এই চার দল এবং উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পরকালীন জীবনে তাঁদের সাথে থাকতে পারাটা হবে বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত চার দল লোকের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা কা ' দের বেলা প্রযোজ্য কতক ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। তবে এটা নিশ্চয়তার সাথে বলা চলে যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন (কোরআন নাযিল সমাপ্ত হবার অনেক পরে যাদের জন্য 'শহীদ' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে) তাঁরা এ অগ্রবর্তী চার দলের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং 'যারা আল্লাহ্ ও

রাসূলের আনুগত্য করেন’ তাঁদের ন্যায় আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিগণও বেহেশতে উপরোক্ত নে ‘আমতপ্রাপ্তদের সাহচর্য লাভ করে ধন্য হবেন।

নবীগণ (‘আঃ) ছিলেন তাঁরা যারা মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত - যাদের কাছে দ্বীন ও শরী ‘আত্ সম্পর্কিত ওয়াহী নাযিল হতো। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (‘আঃ)-এর বংশধরদের [আালে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ও যাদের অন্তর্ভুক্ত] মধ্যকার নিষ্পাপ লোকদেরকে ইমাম মনোনীত করার অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে নিষ্পাপ ইমামগণের (‘আঃ) কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবতঃ এ কারণে তা উল্লেখ করা হয় নি যে, তাঁরা নবীগণের স্থলাভিষিক্ত; কেবল তাঁদের ওপর দ্বীন ও শরী ‘আত্ সংক্রান্ত নতুন ওয়াহী নাযিল না হওয়া (মওজূদ্ ওয়াহী যথেষ্ট বিবেচিত হওয়ায়) ব্যতীত নিষ্পাপত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের ও নবীগণের (‘আঃ) মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। সম্ভবতঃ একই কারণে উক্ত আয়াতে রাসূলগণের (‘আঃ) কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এখানে ‘নবীগণ’ বলতে রাসূলগণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের (‘আঃ) স্থলাভিষিক্ততার জন্য মনোনীত নিষ্পাপ ইমামগণ (‘আঃ)ও শামিল রয়েছেন।

উক্ত আয়াতে “ছ্বিদ্দীক্বীন্” শব্দটির মূল “ছ্বিদ্দীক্ব্” এবং এটি কাজের পুনরাবৃত্তি নির্দেশক (صيغة مبالغة); এর দ্বারা এমন ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয় যারা কথায় ও কাজে সত্যবাদী। কাজে সত্যবাদী বলতে এটাই বুঝায় যে, তাঁদের

কাজ তাঁদের কথার অনুরূপ। কারণ, আমল হচ্ছে ব্যক্তির চিন্তা-বিশ্বাসের নিদর্শন। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলেন তিনি তাঁর অন্তরের খবর প্রকাশ করেন। তেমনি কথার সত্যতার মানে এ-ও যে, তাঁর যে কোনো কথায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটবে। আর যেহেতু কথাও এক ধরনের আমল সেহেতু তিনি যা সঠিক বলে মনে করেন এবং সত্য বলে জানেন কেবল তা-ই বলবেন। তাই তাঁর দেয়া তথ্যে তথ্য ও তথ্য প্রদানকারী উভয়ের সত্যতাই একত্রিত হবে। সুতরাং ছ্বিদ্দীক্ব্ হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি কখনোই মিথ্যা বলেন না এবং সঠিক কাজ ব্যতীত কোনো কাজ করেন না। তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীতই যা কিছু সত্য বলে জানেন তা-ই বলেন এবং সত্য ব্যতীত কিছু দেখেন না। সুতরাং তিনি সব কিছুর প্রকৃত অবস্থা দেখতে পান, সত্য কথা বলেন এবং ন্যায় কাজ সম্পাদন করেন।

উক্ত আয়াত সহ কোরআন মজীদে যে شُّهَدَاءِ (শুহাদা') শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে شهيد (শাহীদ্) শব্দের বহুবচন। আভিধানিক অর্থে শাহীদ্ মানে কোনো কিছুর মূর্ত প্রতীক এবং কোরআন মজীদের পরিভাষায় এর মানে ইসলামের মূর্ত প্রতীক বা মানদণ্ড - যার মানদণ্ডে অন্যদের ভালো-মন্দের অবস্থা পরিমাপ করা হবে। তাই স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)ও শাহীদ। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী আদর্শিক জনগোষ্ঠী বানিয়েছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য (ইসলামের) মূর্ত প্রতীক হও এবং রাসূল হন তোমাদের জন্য (ইসলামের) মূর্ত প্রতীক।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ১৪৩)

আর صَالِحِينَ (ছ্বালেহীন্) হচ্ছে صَالِح (ছ্বালেহ্) শব্দের বহুবচন। ছ্বালেহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'উপযুক্ত' বা 'যথাযথ'। তাঁরা একজন মুসলমানের যা করা উচিত ঠিক তা-ই করেন এবং যা বর্জন করা উচিত তা বর্জন করেন। এ অর্থেই বাংলায় এ শব্দটির অর্থ করা হয় নেককার। তাঁদের যোগ্যতা ও গুণাবলী কোরআনিক পরিভাষার ছিদ্দীক্ব্ ও শাহীদগণের তুলনায় সীমিত, কিন্তু তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা ও গুণাবলী অনুযায়ী দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে থাকেন।

উপরোক্ত আয়াত (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৬৯) নিয়ে এতো বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই প্রমাণ করা যে, যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিগণ (প্রচলিত পরিভাষায় যাদেরকে 'শহীদ' বলা হয়) - যাদের নিষ্পাপত্বের কোনো নিশ্চয়তা নেই, তাঁরাই যখন 'আলামে বারযাখে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জীবিত ও রিয্ক্ব্প্রাপ্ত এবং আনন্দে মশগূল্ তখন তাঁদের অগ্রবর্তী চারটি দলভুক্ত ব্যক্তিগণ 'আলামে বারযাখে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জীবিত ও রিয্ক্ব্প্রাপ্ত হবেন না বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এটা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন

ব্যক্তি যে কাম্য সুযোগ-সুবিধার অধিকারী অপেক্ষাকৃত বেশী যোগ্যতার অধিকারী সে কাম্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না, ঠিক যেভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হলে অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে।

বারযাখী বেহেশত সকল নেককারের জন্য

'আালামে বারযাখে জীবিত থাকা ও রিয্ক্ব্ লাভ করা যে কেবল আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য কোনো ব্যতিক্রমী অনুগ্রহ এমনটি মনে করার কারণ নেই। কারণ, স্বয়ং কোরআন মজীদেও আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন নি এমন লোকদের জন্যও এ ধরনের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ)

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিয্ক্ব্ প্রদান করবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ রিয্ক্ব্দাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পসন্দ করবে এবং অবশ্যই আল্লাহ্ সদাজ্ঞানী ও সহনশীল।" (সূরাহ্ আল্-হাজ্ব্ : ৫৮-৫৯)

এখানে মৃত্যুপরবর্তী রিযক্বের অঙ্গীকার শুধু আল্লাহর রাস্তায় নিহতদের জন্যই করা হয় নি, বরং মুহাজিরদের জন্যও (ইখ্লাছ্ব ও আমলের শর্ত উহ্য) করা

হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য হিজরতকারী ব্যক্তি নিহত না হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলেও (কোনো বড় ধরনের গুনাহ্ না করে থাকলে) তাঁকেও 'আলামে বারযাখে রিয্ক্ব্ দেয়া হবে।

এখানে এ অঙ্গীকারকে শেষ বিচার পরবর্তী বেহেশতের অঙ্গীকার মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, বিভিন্ন আয়াতে যেখানে শেষ বিচার পরবর্তী বেহেশতের অঙ্গীকারের সাথে সাথে তার বিভিন্ন আকর্ষণীয় গুণবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে বা বিভিন্ন নে 'আমতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার বিপরীতে এখানে স্রেফ উত্তম রিয্ক্ব্ ও পসন্দনীয় স্থানে প্রবেশ করানোর সীমিত নে ' আমতের অঙ্গীকার করা হয়েছে অর্থাৎ সীমিত নে 'আমত বিশিষ্ট বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

"সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দিয়েছে তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে; অতঃপর সে নিহতই হোক বা বিজয়ীই হোক, সে ক্ষেত্রে 'অচিরেই' আমি তাকে বিরাট পুরষ্কার প্রদান করবো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৭৪)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরষ্কার প্রদান করেন সে জন্য ঐ ব্যক্তিকে শেষ বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, বরং 'অচিরেই' অর্থাৎ 'আলামে বারযাখেই

প্রদান করা হয় - যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াত থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, এ পুরষ্কার বিশেষভাবে কেবল আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত নয়, বরং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাঁরাও এর মধ্যে শামিল আছেন। অর্থাৎ বারযাখী জীবন ও সে জীবনের রিয্‌ক্ব্ কেবল আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত কোনো ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রশান্ত চিত্ত (নাফ্‌সুল্ মুত্বমাইন্নাহ্)-এর অধিকারী লোকদের মৃত্যুর সাথে সাথে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের কথা বলেছেন; এরশাদ হয়েছে :

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

"হে প্রশান্ত ব্যক্তিসত্তা! তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায়, অতঃপর আমার বান্দাহদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরাহ্ আল্-ফাজর্ : ২৭-৩০)

কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে আল্লাহর দিকে বান্দাহর প্রত্যাবর্তন করা বলতে তার মৃত্যুবরণকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর পর পরই যে বেহেশতে প্রবেশ করতে বলা হয় তা হচ্ছে বারযাখী বেহেশত।

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

"অবিনশ্বর জান্নাত্ যাতে তারা প্রবেশ করবে - যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে তারা যা কিছু ইচ্ছা করবে।

এভাবেই আল্লাহ্ সেই মুত্তাক্বীদেরকে প্রতিদান দেবেন ফেরেশতারা যাদেরকে এ কথা বলতে বলতে উত্তম অবস্থায় মৃত্যু প্রদান করবে যে, “তোমাদের ওপর সালাম; তোমরা যে আমল সম্পাদন করছিলে সে জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।” (সূরাহ্ আন্-নাহল্ : ৩১-৩২)

এখানে উদ্‌ধৃত আয়াত দু'টির প্রথম দিকে অবিনশ্বর জান্নাতের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে এ জান্নাতের অধিবাসীদের মৃত্যুকালীন ও মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্‌ধৃত দ্বিতীয় আয়াত অনুযায়ী তাঁদেরকে মৃত্যুর সাথে সাথে সরাসরি বারযাখী বেহেশতে প্রবেশ করতে বলার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

নাফরমানদের জন্য বারযাখী দোযখ

কোরআন মজীদে শুধু নেককারদের বারযাখী বেহেশতে নে 'আমত্ লাভের কথাই বলা হয় নি, বরং নাফরমানদের বারযাখী দোযখে প্রবেশ ও শাস্তিভোগের কথাও বলা হয়েছে। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে 'আলামে বারযাখে নাফরমানদের শাস্তি ও নেককারদের পুরষ্কারের কথা পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে :

(يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا)

“যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোনো সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা (গুনাহ্গাররা) বলবে : “অন্তরাল দ্বারা

আড়াল (আহা! কোনো অন্তরাল দ্বারা যদি এ অবস্থাটা আড়াল হতো)!” আর তারা যে সব (নেক) আমল করেছে আমি সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেবো এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবো। (অন্যদিকে) সেদিন বেহেশতবাসীরা উত্তম অবস্থানস্থল ও উৎকৃষ্টতর কথোপকথনের অধিকারী হবে।” (সূরাহ্ আল্-ফুরক্বান্ : ২২-২৪)

এখানে সুস্পষ্ট যে, উক্ত তিনটি আয়াতে মৃত্যু ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ, সকল মানুষ মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হলে ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে। তার আগে কারো পক্ষে ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাওয়ার বিষয়টি একান্তই বিরল ব্যতিক্রম। তাছাড়া এর পরবর্তী পাঁচটি আয়াতে (২৫-২৯) ক্বিয়ামতের মহাপ্রলয় ও হাশরের মাঠে কাফেরদের বিলাপের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে - যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে তার পূর্ববর্তী অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু ও তার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

অপর এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ)

“(হে রাসূল!) আপনি যদি দেখেন (তো দেখবেন যে), যালেমরা যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকে, আর ফেরেশতারা তাদের হস্তসমূহ প্রসারিত করে দেয় (এবং তাদেরকে বলে) : তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (তোমাদের নাফ্স্

সমূহকে) বহির্গত করে দাও; আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে, এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াত সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রদর্শন করতে।" (সূরাহ্ আল্-আন্ 'আম্ : ৯৩)

এখানে 'আজ' (الْيَوْمَ) শব্দের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে শেষ বিচার পরবর্তী শাস্তির কথা বলা হয় নি, বরং মৃত্যুপরবর্তী অর্থাৎ 'আলামে বারযাখের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

'আলামে বারযাখে আালে ফির 'আউনের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)

"অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (ফির 'আউনের ক্বওমের মু' মিন ব্যক্তিকে) তাদের ষড়যন্ত্রের অপকৃষ্টতা হতে রক্ষা করলেন এবং আালে ফির 'আউনকে নিকৃষ্ট আযাব্ গ্রাস করলো, তা হচ্ছে আগুন (দোযখ)- যার ওপরে তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন (আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন) : আালে ফির 'আউনকে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।" (সূরাহ্ আল্-মু' মিন্/ আল্-গ্বফির্ : ৪৫-৪৬)

এখানে পর পর দু'ধরনের শাস্তির উল্লেখ থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রথম বারের শাস্তি শেষ বিচার পরবর্তী শাস্তি নয় অর্থাৎ 'আলামে বারযাখের শাস্তি।

হযরত নূহ্ ('আঃ) ও হযরত লূত্ব্ ('আঃ)-এর স্ত্রীদ্বয় প্রসঙ্গে নাযিলকৃত এক আয়াত থেকেও নাফরমানদের জন্য বারযাখী জাহান্নামের শাস্তির কথা জানা যায়। এরশাদ হয়েছে :

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)

"যারা কাফের হয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রীর উপমা দিয়েছেন; তাদের উভয়ই আমার উপযুক্ত বান্দাহদের মধ্যকার দু'জন বান্দাহর অধীনে (বিবাহাধীনে) ছিলো, কিন্তু তাদের উভয়ই তাদের উভয়ের (নূহের ও লূত্বের) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সুতরাং কোনো কিছুই তাদের দু'জনকে আল্লাহ্ থেকে বেনিয়ায্ করতে (রক্ষা করতে) পারলো না। আর (তাদের উভয়কে) বলা হলো : উভয়ই (দোযখে) প্রবেশকারী অন্যান্য লোকদের সাথে দোযখে প্রবেশ কর।" (সূরাহ্ আত্-তাহরীম্ : ১০)

এখানে সুস্পষ্ট যে, তাদের দোযখে প্রবেশের বিষয়টি ইতিমধ্যেই সংঘটিত বিষয় এবং একই সময় আরো যতো নাফরমান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাদের জাহান্নামে প্রবেশের বিষয়টিও ইতিমধ্যেই সংঘটিত। অর্থাৎ এখানে বারযাখী দোযখের কথা বলা হয়েছে।

আত্মা সদাজাগ্রত

কোরআন মজীদের আলোকে ওপরে যে আলোচনা করা হলো তা থেকে সুস্পষ্ট যে, 'আালামে বারযাখ্ অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী ও শেষ বিচার পূর্ববর্তী জগত

কোনো ঘুমন্ত জগত নয় এবং সেখানে মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তা বা আত্মা সমূহ ঘুমিয়ে নেই, বরং সুখে বা দুঃখে তথা বারযাখী বেহেশতে বা দোযখে আছে। অবশ্য তাদের শাস্তি ও নে 'আমতে ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া অনেকের ব্যক্তিসত্তা এমন অবস্থায় থাকাও স্বাভাবিক যাকে সুখ বা দুঃখ এতদুভয়ের কোনোটি হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিসত্তাগুলো সেখানে জাগ্রত। তাই বলা যেতে পারে যে, 'আলামে বারযাখ্ হচ্ছে জাগ্রত জগত।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'আলামে বারযাখ্ কি কেবলই আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার জগত, নাকি সেখানে সে পার্থিব বস্তুদেহের বিকল্প কোনো ভিন্ন ধরনের দেহের অধিকারী থাকে এবং থাকলে সে দেহ ও পার্থিব দেহের মধ্যে কতোখানি মিল আছে ও কতোখানি অমিল আছে? এ ব্যাপারে নিশ্চিত জবাব দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ওপরে যে সব আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকে 'আলামে বারযাখের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং এ-ও প্রমাণিত হয় যে, 'আলামে বারযাখ্ কথিত 'ঘুমের জগত' নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, প্রকৃত পক্ষে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার জন্য 'ঘুমন্ত ' কথাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। যদিও দেহধারী অবস্থায় ও দেহবিহীন অবস্থায় আত্মার সময় সংক্রান্ত অনুভূতিতে পার্থক্য হবে এটাই স্বাভাবিক, তেমনি আনন্দ ও বিষাদের অবস্থায়ও তার সময় সংক্রান্ত অনুভূতি অভিন্ন হয় না, তবে যে কোনো অবস্থায়ই তার জন্য 'ঘুমন্ত' অবস্থা অকল্পনীয়। কারণ, ঘুম

হচ্ছে এক ধরনের বিশ্রাম - যা বস্তুদেহের জন্য অপরিহার্য। কর্মতৎপরতার কারণে ও সময়ের প্রবাহে দেহে যে ক্ষয় ও ক্লান্তির সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য খাদ্য-পানীয়ের পাশাপাশি বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়, আর ঘুম হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের বিশ্রাম। কিন্তু পার্থিব জগতে বস্তুদেহ ঘুমিয়ে পড়লেও আত্মার কর্মতৎপরতা পুরোপুরি স্থগিত হয়ে যায় না। কারণ, তাহলে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারতো না। বলা বাহুল্য যে, স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে নাফ্‌স্‌ বা আত্মার কাজ। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তির শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয় কর্মতৎপরতা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকে। তা সত্ত্বেও সে স্বপ্ন দেখতে পায়। অতএব, নিঃসন্দেহে তা আত্মার কাজ।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, শরীরের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়া - যা অব্যাহত থাকলে আমরা কোনো প্রাণশীল সৃষ্টিকে জীবিত বলে গণ্য করি, তার ও শরীরের দ্বারা অ-স্বয়ংক্রিয় ঐচ্ছিক কার্য পরিচালনাকারী আত্মিক শক্তির মধ্যে মৌলিক গুণগত পার্থক্য রয়েছে। শরীরের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুধু শরীরকে ব্যবহারোপযোগী রাখে এবং আত্মা সে শরীরকে ব্যবহার করে। ফলে কারো শরীর স্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়লে অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটলে তার আত্মার জন্য আর তার শরীর ব্যবহারোপযোগী থাকে না। কিন্তু এর ফলে আত্মার নিজের অবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

শরীরের সক্রিয়তা বা জীবন এবং আত্মা বা নাফ্স্ যে স্বতন্ত্র সে সম্পর্কে কোরআন মজীদ থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল্ 'আলামীন এরশাদ করেন :

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

"আল্লাহ্ নাফসগুলোকে আয়ত্তে নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যে মৃত্যুবরণ করে না তার নিদ্রার সময়। অতঃপর, যার ওপর মৃত্যুর ফয়ছ্বালা আপতিত হয়েছে তাকে রেখে দেন এবং অন্যদেরকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (ফেরত) পাঠিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাদি রয়েছে।" (সূরাহ্ আয্-যুমার্ : ৪২)

এখানে লক্ষণীয় যে, মৃত্যু ও ঘুম উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নাফসকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে নেয়ার কথা বুঝাতে গিয়ে অভিন্ন ক্রিয়া يَتَوَفَّى ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ অনেক সময় স্বপ্ন দেখে; তাতে সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ অনুভূতির তীব্রতায় মানুষ জাগ্রত হবার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, বা পাগল হয়ে যেতে পারে, এমনকি মারা যেতেও পারে। স্বপ্নে সময়ের অনুভূতি জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির তুলনায় শ্লথতর বা দ্রুততর হতে পারে। এখানে ঘুমের ও মৃত্যুর অবস্থায় নাফ্স্ বা আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীনে নেয়ার মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, মৃত্যু হলে তার নাফসকে

ফিরিয়ে দেয়া হয় না, ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই একই ক্রিয়া ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে, উভয় অবস্থায়ই নাফ্স্ বা আত্মার গুণগত অবস্থা অভিন্ন থাকে। এমতাবস্থায়, ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার জন্য যদি 'ঘুমন্ত' থাকা অপরিহার্য না হয়, বরং সে স্বপ্নে কর্মতৎপর ও অনুভূতিসম্পন্ন থাকতে পারে তাহলে মৃত ব্যক্তির আত্মার ঘুমন্ত থাকার এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতিহীন ও কর্মতৎপরতাহীন থাকার কোনো কারণ নেই। অবশ্য 'আলামে বারযাখে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা জাগ্রত থাকলেও তার কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র ও সে ক্ষেত্রে ব্যবহার্য স্বাধীনতা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'আলামে বারযাখের জন্য নির্ধারিত বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

‘আালামে বারযাখে নাফ্স্-এর কর্মতৎপরতা

‘আালামে বারযাখ্ ঘুমের জগত নয়, বরং জাগ্রত জগত - যেখানে কেউ বারযাখী বেহেশতের নে ‘আমতের দ্বারা পুরষ্কৃত হচ্ছে ও কেউ বারযাখী দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছে যদিও সে পুরষ্কার ও শাস্তির মাত্রা শেষ বিচার পরবর্তী পুরষ্কার ও শাস্তির তুলনায় যৎকিঞ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ‘আালামে বারযাখে নাফ্স্ সমূহ কি শুধু নীরবে পুরষ্কার ও শাস্তি ভোগ করছে, নাকি সেখানে তাদের কোনো ধরনের কর্মতৎপরতাও আছে?

বলা বাহুল্য যে, ‘আালামে বারযাখ্ বস্তুজগত নয়, সুতরাং সেখানে আমাদের পার্থিব জগতের ন্যায় রূযী-রোযগার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও অন্যান্য ধরনের পার্থিব কর্মকাণ্ড থাকার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে কি সে জগত একটি নীরব ও নিষ্ক্রিয় জগত? কোরআন মজীদের আয়াত থেকে তা প্রমাণিত হয় না। কোরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, ঐ জগতে যে ধরনের কর্মতৎপরতা সম্ভব নাফ্স্ সমূহের সে ধরনের কর্মতৎপরতা রয়েছে; সেখানে ভালো অবস্থায় থাকা নাফ্স্ সমূহ আনন্দ প্রকাশ করে থাকে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বভাবতঃই খারাপ অবস্থায় থাকা নাফ্স্ সমূহ শাস্তিপ্রাপ্তির কারণে আফ্সোস্ করে থাকে।

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন :

(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত ও রিয্ক্ব্প্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন সে কারণে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা রয়েছে - যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি, তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে, কারণ, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্বত হবে না। তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নে 'আমত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্ মু' মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না, আনন্দ প্রকাশ করে থাকে।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান্ : ১৬৯-১৭১)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিগণ 'আালমে বারযাখে আল্লাহ্ তা'আলার নে 'আমত্ ও অনুগ্রহ লাভের কারণে এবং দুনিয়ার বুকে থেকে যাওয়া নেক বান্দাহদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। সুতরাং এতে সন্দেহ নেই যে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নে 'আমত্ ও অনুগ্রহ লাভকারী সকলেই এভাবে আনন্দ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে তাঁদের চেয়ে অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী-রসূলগণ ('আঃ) ও মা 'ছ্বূম্ ইমামগণ (আঃ), ছ্বিদ্দীক্ব্গণ, শহীদগণ ও ছ্বালেহ্ বান্দাহ্গণ স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশী নে 'আমত ও অনুগ্রহ লাভ করেন এবং এ কারণে আনন্দ প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে আনন্দ প্রকাশ করা ছাড়াও 'আলমে বারযাখে তাঁদের আরো কোনো ধরনের কর্মতৎপরতা আছে কিনা।

হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মি 'রাজ্-এর ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ইসলামের সকল ধারার বর্ণনার মধ্যে যে সব বিষয় অভিন্ন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, তাঁর ইমামতীতে অতীতের সমস্ত নবী-রাসূল ('আঃ) নামায আদায় করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'আলমে বারযাখে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও নামায আদায় করা সম্ভব। যদিও সেখানকার এ সব আমল ব্যক্তির আমলনামায় - যার ভিত্তিতে শেষ বিচারের দিনে বিচার করা হবে - যোগ হবে না, তথাপি, কেবল নবী-রাসূলগণের ('আঃ) নাফ্স্ নয়, আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাহদের সকলের নাফ্স্ই সেখানে হামদ ও নামায আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন এটাই স্বাভাবিক।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, 'আলামে বারযাখের নেককার অধিবাসীগণ এ পার্থিব জগতের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে এমন কোনো কর্মতৎপরতা চালাতে পারেন কিনা? এর মানে হচ্ছে, তাঁরা পার্থিব জগতের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোনো ধরনের সুপারিশ করতে পারেন কিনা?

এর জবাবও ইতিবাচক। কারণ, তাঁদের আমল তাঁদের নিজেদের আমলনামায় যোগ হবার সুযোগ না থাকলেও যেহেতু তাঁদের সক্রিয়তা প্রমাণিত বিষয় সেহেতু পার্থিব জগতের অধিবাসীদের জন্য তাঁদের মধ্যকার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো 'আ বা সুপারিশ করার সুযোগ না থাকার

কোনো কারণ নেই। অবশ্য সে দো 'আ ও সুপারিশ কবূল করা বা না করা একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

"(হে রাসূল!) আপনি তাদের জন্য দো 'আ করুন; নিঃসন্দেহে আপনার দো 'আ তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ : ১০৩)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে আরো এরশাদ করেন :

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ)

"সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ইস্তগ্বফার্ করুন।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান্ : ১৫৯)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

(وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)

"তারা যখন নিজদের ওপর যুলুম করলো (গুনাহ্ করলো) তখন যদি তারা (হে রাসূল!) আপনার কাছে আসতো, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবাহ্ কবূলকারী মেহেরবানরূপে পেতো।" (সূরাহ্ আন্-নিসা' : ৬৪)

যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না সেহেতু ক্বিয়ামত পর্যন্ত

সকল মুসলমানের জন্য তাঁর দো 'আ ও ইস্তিগ্বফার্ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকা অপরিহার্য। বরং যে সব মুসলমান তাঁর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের তুলনায় পরবর্তীদের জন্য তাঁর দো ' আ ও ইস্তিগ্বফারের প্রয়োজন অনেক বেশী। সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পরেও তাঁর কাছে দো 'আ ও ইস্তিগ্বফারের জন্য অনুরোধ জানানোর পথে কোনো বাধা থাকতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পার যে, আমাদের আবেদন তিনি শুনতে পান কিনা?

আমরা নামাযের মধ্যে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সরাসরি সম্বোধন করে সালাম দেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা শুনতে পান। অনুরূপভাবে আমরা নামাযের বাইরেও দুরূদ পাঠের সময় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সরাসরি সম্বোধন করে সালাম দেই।

বস্তুতঃ পার্থিব জগতের অধিবাসীদের কাছে বাণী পৌঁছানোর পথে যে সব বাধা আছে, 'আলামে বারযাখের নেককার অধিবাসীরা অবশ্যই সে সব বাধা থেকে মুক্ত। 'আলামে বারযাখে বস্তুজগতের স্থানিক ব্যবধানের কোনো কার্যকরতা থাকতে পারে না। সুতরাং যখন যে কোনো স্থান থেকে তাঁদের উদ্দেশে কেউ কিছু বললে তা তাঁরা শুনতে পাবেন এটাই স্বাভাবিক। অতএব, নবী করীম (ছ্বাঃ)কে উদ্দেশ করে একই সময় দুনিয়ার যতো জায়গা থেকে যতো লোক সালাম প্রদান করুক তা তিনি সাথে সাথে শুনতে পান।

অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে যে সালাম দেই ফেরেশতা তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এরূপ হলে সম্বোধন করে সালাম না দিয়ে তৃতীয় পুরুষে সালাম দিতে হতো অর্থাৎ السلام علیک یا ایها النبی ... (হে নবী! আপনার ওপরে সালাম, ...) না বলে السلام علي النبی ... (নবীর ওপরে সালাম, ...) বলতে হতো।

এভাবে ‘আলামে বারযাখে থেকে বস্তুজগতের অধিবাসীদের কথা শুনতে পাওয়ার বিষয়টি কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জন্য এককভাবে নির্ধারিত কোনো বিষয় নয়। তাই আমরা মুসলমানদের ক্ববরে গিয়ে ক্ববরবাসীদেরকে সম্বোধন করে সালাম দেই, বলি : السلام علیکم یا اهل القبور - “হে ক্ববরবাসীগণ! আপনাদের ওপর সালাম।” এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা আমাদের সালাম শুনতে পান।

সুতরাং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এবং অন্যান্য নবী-রাসূল ও আহলে বাইতের মা ‘ছ্বূম্ ইমামগণ (‘আঃ) সহ আল্লাহ্ তা‘আলার আরো যে সব খাছ্ব্ বান্দাহ্ পার্থিব জীবনে থাকাকালে তাঁদের কাছে দো ‘আ চাওয়া যেতো এবং তাঁরা লোকদের জন্য দো ‘আ করতেন তাঁরা ‘আলামে বারযাখের অধিবাসী হবার পরেও তাঁদের কাছে দো ‘আ চাওয়ায় কোনো বাধা নেই এবং তাঁরা শুনতে পান, যদিও আমরা জানি না আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দো ‘আ করেছেন কিনা বা করে থাকলে আল্লাহ্ তা কবূল করেছেন কিনা, ঠিক যেভাবে তাঁরা পার্থিব জীবনে

থাকাকালে যে সব ক্ষেত্রে দো 'আ করতেন আল্লাহ্ তা কবূল করেছেন কিনা তা আমরা জানি না। তবে দো 'আ বা সুপারিশ চাওয়ায় কোনোই বাধা নেই।

আলামে বারযাখ্ : বিবিধ প্রসঙ্গ

বারযাখী বেহেশতের রিয্ক্ব্ কেমন?

যেহেতু কোরআন মজীদে আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিদেরকে রিয্ক্ব্ প্রদানের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু সেখানে যে, সকল নেক বান্দাহকে রিয্ক্ব্ প্রদান করা হয় তাতে সন্দেহের কোনোই কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানকার রিয্ক্ব্ কী ধরনের?

শেষ বিচারের পরে যারা বেহেশতে যাবেন তাঁরা সেখানে যে সব রিয্ক্ব্ ভোগ করবেন সে সম্পর্কে তেমন একটা প্রশ্ন জাগে না। কারণ, বিচারবুদ্ধি (‘আক্ব্ল্) যেমন সে সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করতে পারে তেমনি কোরআন মজীদেও সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ বিচারের পরে মানুষ এ পৃথিবীর জীবনের শরীরের ন্যায় শরীরের অধিকারী হবে, তবে সে শরীর হবে অবিনশ্বর, বিশেষ করে বেহেশতীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হবে ঠিক যেমনটি হওয়া মানুষের পসন্দনীয় - যাতে বান্দাহ্ তদ্সহ অনন্ত নে ‘আমত ভোগ করতে পারে। তেমনি সেখানকার নে ‘আমত সমূহ পৃথিবীর নে ‘আমত সমূহের ন্যায় হবে, কিন্তু পৃথিবীর নে ‘আমত সমূহের ন্যায় তাতে কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, সেখানকার খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ফলে পায়খানা-প্রস্রাব হবে না। কারণ, পৃথিবীর জীবনে মানুষের পায়খানা-প্রস্রাব হবার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ এখানকার খাদ্য-পানীয়ে মানুষের শরীরের

গ্রহণোপযোগী উপাদান (স্বাদ ও পুষ্টি) ছাড়াও এতদ্বহির্ভূত উপাদানও থাকে, দ্বিতীয়তঃ মানুষের গ্রহণক্ষমতা (হযমশক্তি) সীমিত হবার কারণে গ্রহণোপযোগী সব উপাদানও সে গ্রহণ করতে পারে না। বেহেশতে এ ধরনের সমস্যা থাকবে না।

বিচারবুদ্ধি বলে, যেহেতু বেহেশতে অক্ষয় শরীরে পুষ্টির প্রয়োজন হওয়ার কথা নয় সেহেতু সেখানকার খাদ্য-পানীয় বহ্যিক দিক থেকে পৃথিবীর খাদ্য-পানীয়ের ন্যায় হাতে নেয়া, কামড় দেয়া ও গিলে ফেলার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও তার পুরোটাই হবে স্বাদ এবং তাই গ্রহণের সাথে সাথেই তা শরীরে আত্মস্থ হয়ে যাবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, 'আলামে বারযাখের রিয্ক্ব্-ও এ ধরনেরই হবে।

অনেকে মনে করেন যে, আলামে বারযাখে যেহেতু মানুষ কোনো শরীরের অধিকারী থাকে না সেহেতু সেখানে রিয্ক্ব্ বলতে আত্মিক প্রশান্তি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ ধারণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, আত্মিক প্রশান্তি হচ্ছে এমন একটি আত্মিক অবস্থা যা যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ তা ধারাবাহিকভাবেই থাকবে, কিন্তু অন্য কোনোরূপ নিদর্শন ছাড়াই শুধু "রিয্ক্ব্ " বললে মস্তিষ্কে সর্বপ্রথম যে তাৎপর্য ফুটে ওঠে তা হচ্ছে খাদ্য-পানীয়; অন্যান্য দানকে সাধারণতঃ নে 'আমত বলা হয় এবং সে সব ক্ষেত্রে নে ' আমতের উপকরণের নামের সাথে "রিয্ক্ব্" কথাটি উল্লেখ করা হলে কেবল

তখনই "রিয্ক্ব্" থেকে সে অর্থ গ্রহণ করা যাবে, যেমন : সন্তানকেও রিয্ক্ব্ বলা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন মজীদে 'আলামে বারযাখে কোনো বিশেষ ধরনের রিয্ক্ব্ প্রদানের কথা বলা হয় নি, সুতরাং এ থেকে প্রধানতঃ খাদ্য-পানীয় ধরে নিতে হবে এবং অন্য ধরনের রিয্ক্ব্ থাকলেও খাদ্য-পানীয় অবশ্যই রয়েছে। আর সেখানকার খাদ্য-পানীয় পার্থিব জীবনের খাদ্য-পানীয়ের দোষ-ত্রুটি থেকে অবশ্যই মুক্ত, তবে তার গুণগত মান (বিশেষতঃ স্বাদ) নিঃসন্দেহে শেষ বিচারের পরবর্তী বেহেশতের খাদ্য-পানীয়ের মানের সমান নয়, বরং সেখানকার ও পার্থিব জীবনের খাদ্য-পানীয়ের স্বাদের মাঝামাঝি হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শেষ বিচার পরবর্তী বেহেশতে বস্তুদেহের কারণে খাদ্য-পানীয় স্পর্শ করা যাবে, কিন্তু 'আলামে বারযাখে তো বস্তুদেহ নেই, তাহলে সেখানে স্পর্শনীয় খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা সম্ভব হবে কী করে?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, পার্থিব জীবনে আমরা শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা যে সব কাজ করে থাকি আসলে আমাদের নাফ্স্-ই ইন্দ্রয়নিচয়ের দ্বারা তা করিয়ে থাকে। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ হাত কোনো কিছু স্পর্শ করলেও প্রকৃত পক্ষে নাফ্স্-ই স্পর্শ করে; হাত তার স্পর্শ করার মাধ্যম মাত্র। কিন্তু নাফ্স্ শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্য ছাড়াই ইন্দ্রিয়নিচয়ের

অনুভূতি অর্জন করতে পারে। তাই ঘুমের সময় শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় থাকলেও নাফ্স্ স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়নিচয়ের অনুভূতি লাভ করে থাকে। সুতরাং 'আলামে বারযাখে নাফ্স্-এর পক্ষে শেষ বিচার পরবর্তী বেহেশতের রিযক্বের অনুরূপ ক্রটিমুক্ত রিয্ক্ব্ (যদিও বেহেশতের রিযক্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মানের এবং পার্থিব রিযক্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের) গ্রহণ করতে পারে এতে সন্দেহের কারণ নেই। তবে এ রিয্ক্ব্ সংখ্যাগত ও পরিমাণগত দিক থেকে কতোটা সীমিত সে সম্পর্কে আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়।

'আলামে বারযাখের রিয্ক্ব্ মানে যে, কেবল অব্যাহত আত্মিক প্রশান্তি নয়, বরং এতদ্সহ খাদ্য-পানীয় তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে আালে ফির 'আউন্-কে সকাল-সন্ধ্যা দোযখের আগুনের ওপর পেশ করা হয়। সেখানকার পুরষ্কার ও শাস্তি কেবল আত্মিক হলে নেককারদের আত্মিক প্রশান্তির মোকাবিলায় আালে ফির 'আউনকে কেবল আত্মিক অশান্তিতে রাখা হতো।

'আলামে বারযাখে রিয্ক্ব্ গ্রহণের বিষয়টির স্বরূপ নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হবার পিছনে নিহিত মূল কারণ হচ্ছে নাফ্স্-এর স্বরূপ ও ঐ জগতে নাফসের অবস্থানের ধরন সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ধারণা না থাকা। জিন সূক্ষ্ম দেহধারী প্রাণী, কিন্তু তারা বস্তুগত রিয্ক্ব্ গ্রহণ করে থাকে। তাদের রিয্ক্ব্ গ্রহণের ধরন সম্পর্কে আমাদের অকাট্য ধারণা নেই।

অনেকের মতে, তারা তাদের খাদ্যবস্তু ও পানীয় থেকে শক্তি (এনার্জি/ পুষ্টি) ও স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের দ্বারা শক্তি ও স্বাদ গ্রহণ করার পর উক্ত খাদ্যবস্তুর পুষ্টি ও স্বাদ বিহীন বস্তুগত উপাদান বাহ্যিক দিক থেকে হুবহু পড়ে থাকে।

নাফ্‌স্‌ সমূহ কি অবস্তুগত সত্তা, নাকি এক ধরনের সূক্ষ্ম উপাদানের সত্তা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অনেকের মতে তা সূক্ষ্ম উপাদানের সত্তা এবং অনেকের মতে তা অবস্তুগত, তবে 'আলামে বারযাখে তাদেরকে এক ধরনের সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী করে রাখা হয়। (এ সম্পর্কে পরে আরো কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) তাই 'আলামে বারযাখের অধিবাসী নেককার ব্যক্তিদের নাফ্‌স্‌ সমূহকে দেয় খাদ্য-পানীয় যেহেতু শেষ বিচার পরবর্তী খাদ্য-পানীয়ের (যা শুধুই স্বাদ) অনুরূপ সেহেতু তাঁদের পক্ষে তা থেকে ঘ্রাণ ও স্পর্শানুভূতি সহকারে স্বাদ গ্রহণ তথা তার পুরোটাই গ্রহণ করতে পারায় কোনো সমস্যা হবার কারণ নেই।

মৃত ব্যক্তির বস্তুদেহ ও নাফ্‌স্‌-এর মধ্যে সম্পর্ক

এটা সন্দেহাতীত যে, 'আলামে বারযাখ্‌ বা ক্বররের জগত মানে মাটির ক্বররের ভিতরের পরিবেশ নয়, কারণ, সকল মৃতদেহের মাটির ক্বরর হয় না। বরং 'আলামে বারযাখ্‌ বা ক্বররের জগত মানে নাফ্‌স্‌-এর জগত - যা একটি

অবস্তুগত জগত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির বস্তুদেহ ও 'আলামে বারযাখে অবস্থানরত তার নাফ্‌স্‌-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক ও যোগসূত্র থাকে কি?

এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব দেয়া কঠিন। কারণ, কোরআন মজীদে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি এবং বিচারবুদ্ধিও এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে অক্ষম। তবে এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ থেকে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেও যেমন আভাস দেয়া হয়েছে যে, যেহেতু 'আলামে বারযাখ্‌ কোনো বস্তুগত জগত নয়, বরং একটি ভিন্ন মাত্রার জগত (অবস্তুগত জগত) সেহেতু এ জগত এ পৃথিবী থেকে দূরে হওয়া যেমন যরূরী নয়, তেমনি পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাও অপরিহার্য নয়। বরং অবস্তুগত জগত হবার কারণে এ বস্তুগত জগতের কোনো কিছুর সাথে সাংঘর্ষিকতা ছাড়াই তা এ পৃথিবী ও বস্তুজগতের অন্য সব কিছুর সম-অবস্থানে অবস্থান করতে পারে, ঠিক যেভাবে পানি বা কাঁচের মধ্য দিয়ে গমনকালে আলোর তার মধ্যে অবস্থানে কোনো সমস্যা হয় না। অন্যদিকে 'আলামে বারযাখ্‌ হচ্ছে একটি কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন জগত যেখানে কেবল অনুমতির অধিকারী নাফ্‌স্‌ সমূহ অনুমোদিত সীমিত তৎপরতা চালাতে পারে। সুতরাং তাদের স্বীয় বস্তুদেহের সাথে সম্পর্ক থাকবেই এটা অকাট্যভাবে বলা চলে না, তেমনি সম্পর্ক নেই তা-ও বলা চলে না।

অবশ্য সাধারণভাবে মানবিক প্রবণতার ভিত্তিতে বলা চলে যে, প্রতিটি নাফসের স্বীয় বস্তুদেহের সাথে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক - যার মানে অবশ্য এ নয় যে, নাফ্স্ ঐ বস্তুদেহের মধ্যে অবস্থান করে। যদিও মুসলমানদের একটি সর্বসম্মত আমল থেকে এমনটি মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং স্বীয় বস্তুদেহের সাথে ‘আলামে বারযাখে অবস্থানরত নাফ্স্-এর সম্পর্কটা হচ্ছে এক ধরনের আত্মিক ও মানসিক সম্পর্ক বা টান।

আমরা যে বাড়ীটিতে যুগের পর যুগ বসবাস করেছি, কিন্তু এরপর বিক্রি করে দিয়েছি বা কেউ জোর করে দখল করে নিয়েছে, বা তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে, এমনকি হতে পারে যে, তার ধ্বংস্তূপও সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং কেবল খালি জায়গা পড়ে আছে বা সে জায়গায় কেউ নতুন বাড়ী তৈরী করেছে, সে বাড়ীটি বা তার ধ্বংস্তূপ বা তার জায়গাটির সাথে আমাদের আত্মিক-মানসিক সম্পর্ক বা টানের সাথে একে তুলনা করা যেতে পারে। ধরুন, এ বাড়ীটির বা তার ধ্বংসস্তূপের বা তার জায়গার চারদিকে মযবূত কাঁচের দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে যার ভিতর দিয়ে আমরা বাড়ীটির ভিতরটা বা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি এবং বার বার আমাদের দৃষ্টি তার ভিতরে পতিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা তাতে প্রবেশ করতে পারছি না। তেমনি ঐ বাড়ীতে থাকাকালে আমরা যা কিছু ব্যবহার করেছি তা যদি অন্যত্রও নিয়ে যাওয়া হয়

এবং আমরা তা চিনতে পারি তাহলে তার প্রতিও আমরা আত্মিক সম্পর্ক বা মনের টান অনুভব করি।

বস্তুতঃ শুধু বস্তুদেহের সাথে নয়, ব্যক্তির সারা জীবনের স্মৃতিবিজড়িত সব কিছুর সাথে এবং স্বজনদের সাথেও নাফসের সম্পর্কটা এ ধরনের বলে মনে করা যেতে পারে। তবে এখানে বাধাটা কাঁচের দেয়ালের ন্যায় বস্তুগত নয়, বরং মাত্রাগত। কারণ, বস্তুজগত ও 'আলামে বারযাখ্ ভিন্ন মাত্রার জগত।

ওপরে মুসলমানদের যে সর্বসম্মত আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আমরা মুসলমানদের ক্কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে সালাম দেই; বলি : "আস্-সালামু 'আলাইকুম্ ইয়া আহলাল্ ক্বুবূর্।" (হে ক্কবরবাসীরা! তোমাদের ওপর সালাম।) - যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তা শুনতে পান। নইলে তাঁদেরকে নামপুরুষে উল্লেখ করে সালাম দিতে হতো; বলতে হতো : "আস্-সালামু 'আলা আহলিল্ ক্বুবূর্।" (ক্কবরবাসীদের ওপর সালাম।)

এ থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, মৃতদের নাফ্স্ আমাদের কথা শুনতে পায়, কিন্তু এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁদের নাফসগুলো ঐ ক্কবরগুলোর মধ্যেই রয়েছে। বরং 'আলামে বারযাখ্ অবস্তুগত জগত বিধায় আমরা যেখানেই থাকি না কেন স্থানগত ব্যবধান তাঁদের ও আমাদের মধ্যে কোনো প্রকৃত ব্যবধান নয়। সুতরাং ক্কবরের কাছে না গিয়েও সম্বোধন করে সালাম দিলে তাঁরা শুনতে পান। এ কারণেই আমরা নামাযের মধ্যে হযরত

রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে সালাম দেই যদিও আমরা তাঁর ক্ববর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি।

বস্তুতঃ আমরা যে ক্ববরের কাছে গিয়ে ক্ববরবাসীদেরকে সালাম দেই তার ফলে তাঁদের শ্রবণক্ষমতার ক্ষেত্রে দূর থেকে সালাম দেয়া হতে কোনো পার্থক্য হয় না। বরং ক্ববরের কাছে গেলে তাঁদের সাথে আমাদের আত্মিক বা মানসিক সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাঁদের জীবনেতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে, মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষের ডিএনএ-র ভিতরে তার গোটা জীবনের ইতিহাস কোড্ আকারে লিপিবদ্ধ আছে। শুধু তা-ই নয়, কোনো ব্যক্তি যে সব জায়গায় কোনো না কোনো কর্মতৎপরতা চালিয়েছে এবং যে সব জিনিস ব্যবহার করেছে তার সব কিছুতেই ঐ ঘটনার বা তার জীবনেতিহাসের অন্ততঃ অংশবিশেষের ছাপ আছে - এটা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে আমরা যখন ঐ সব জায়গায় যাই অথবা ঐ সব জিনিস দেখি বা স্পর্শ করি তখন আমরা মানসিক দিক থেকে, এমনকি কতক ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেও, ঐ সব ব্যক্তির নাফসের অধিকতর কাছাকাছি চলে আসি। এমতাবস্থায় ঐ সব স্থান ও বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাফসের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আলামে বারযাখ্ ও বস্তুজগতের মধ্যে যোগাযোগ

'আলামে বারযাখ্ ও বস্তুজগতের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব কি? এ প্রশ্নটি হচ্ছে 'আলামে বারযাখ্ সংক্রান্ত আলোচনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের অন্যতম।

এখানে যোগাযোগের কয়েকটি ধরন হতে পারে : (১) এক জগতের অধিবাসীদের অন্য জগতে সরাসরি প্রবেশ ও বিচরণ, (২) এক জগতের অধিবাসীদের অন্য জগতের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী থাকা, (৩) পরস্পরের প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা প্রেরণ এবং পরস্পরের কাছে আবেদন করা, (৪) পরস্পরের জন্য দো 'আ করা, (৫) এক জগতের অধিবাসীদের অন্য জগতের অধিবাসীদের ওপরে কোনো না কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার, (৬) এক জগতের অধিবাসীদের অন্য জগতে হস্তক্ষেপ।

(১) যেহেতু "বারযাখ্" শব্দের মানে হচ্ছে অন্তরাল এবং 'আলামে বারযাখ্ মানে এ বস্তুজগতের সাথে অন্তরাল রয়েছে এমন একটি জগত, সেহেতু এর মানে হচ্ছে এ দুই জগতের অধিবাসীদের পরস্পরের জগতে প্রবেশ সম্ভব নয়। তবে কোরআন মজীদের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ বাধা বিশেষভাবে 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদের জন্য ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রযোজ্য; বস্তুজগতের অধিবাসীদের জন্য তা অনুরূপভাবে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কাফেররা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তারা যথাযথ আমল করার জন্য পুনরায়

তাদেরকে পার্থিব জীবনে ফেরত পাঠানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে তাদের পক্ষে আর পার্থিব জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। কারণ, এরশাদ হয়েছে :

(وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)

"আর পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাদের পশ্চাতে রয়েছে এক অন্তরায় (বারযাখ্)।" (সূরাহ্ আল্-মু' মিনূন্ : ১০০)

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে কোনো মৃত ব্যক্তিকে এ পৃথিবীর বুকেই পুনর্জীবন দান করতে পারেন, ঠিক যেভাবে তিনি হযরত উযাইর্ ('আঃ)কে পুনর্জীবিত করেছিলেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর 'আলামে বারযাখের অধিবাসী হিসেবে গণ্য হচ্ছে না অর্থাৎ কারো পক্ষে 'আলামে বারযাখের অধিবাসী থাকা অবস্থায় বস্তুজগতে প্রবেশ ও বিচরণ করা সম্ভব নয়, যদিও আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি আসা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু বস্তুজগতের অধিবাসীদের (সকলের) সামনে 'আলামে বারযাখে প্রবেশের পথে এ ধরনের অন্তরাল রয়েছে এমন কথা বলা হয় নি। তাছাড়া সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মি 'রাজের সময় পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূল ('আঃ) তাঁর ইমামতীতে নামায আদায় করেছেন। আর যেহেতু 'আলামে বারযাখের কোনো অধিবাসীর পক্ষেই বস্তুজগতে প্রবেশ অর্থাৎ ফিরে আসা তথা বস্তুগত শরীরী রূপ ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু

এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) ‘আলামে বারযাখে প্রবেশ করেছিলেন এবং এর ফলেই তাঁদের সকলের পক্ষে রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) পিছনে নামায আদায় করা সম্ভব হয়েছিলো। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্যতিক্রম হিসেবে আল্লাহ্ তা‘আলার অনুমতিক্রমে বা অনুগ্রহে বস্তুজগতের কোনো কোনো অধিবাসীর পক্ষে ‘আলামে বারযাখে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে।

(২) ‘আলামে বারযাখের অধিবাসীদের পক্ষে বস্তুজগতের অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী থাকা সাধারণভাবে সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ, তা “বারযাখ্” -এর তাৎপর্যের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে আল্লাহ্ তা‘আলা কাউকে এ সুযোগ দিলে তা স্বতন্ত্র। তাছাড়া একই কারণে অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের কারো পক্ষে বস্তুজগতের কোনো ব্যাপারে পরোক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব হতে পারে, যেমন : বস্তুজগতের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদন ব্যপদেশে কোনো তথ্য অবগত করা হতে পারে। অর্থাৎ বস্তুজগতের অধিবাসী স্বীয় সমস্যার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে তা দূরীকরণের জন্য সুপারিশ করার অনুরোধ জানালে সেই সুবাদে বস্তুজগতের কিছু তথ্যও জানানো হয়ে যায়। এছাড়াও আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর খাছ্ব্ বান্দাহ্দেরকে বস্তুজগতকে (তাতে প্রবেশ না করেও) পুরোপুরি প্রত্যক্ষকরণের সুযোগ দিতে পারেন।

(৩) বস্তুজগতের অধিবাসীরা 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদেরকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাতে পারে এটা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া আমরা এ-ও উল্লেখ করেছি যে, বস্তুজগতের অধিবাসীরা তাদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুপারিশ করার জন্য 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদের কাছে আবেদন করতে পারে। আর তাঁরা এ সব সালাম, শুভেচ্ছা ও আবেদন শুনতে পান, যদিও আবেদনের ক্ষেত্রে যার কাছে আবেদন করা হয়েছে তাঁর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুপারিশ করার জন্য অনুমতি আছে কিনা বা থাকলেও আল্লাহ্ তা'আলা সে সুপারিশ রক্ষা করবেন কিনা তা স্বতন্ত্র বিষয়। এর বিপরীতে 'আলামে বারযাখের অধিবাসীরা বস্তুজগতের অধিবাসীদের কাছে সরাসরি সালাম, শুভেচ্ছা ও আবেদন জানাতে পারে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই এবং পারলেও বস্তুজগতের অধিবাসীরা তা প্রত্যক্ষভাবে শুনতে পায় না। অবশ্য বিভিন্ন ইসলামী সূত্র অনুযায়ী তারা স্বজনদের প্রতি এ মর্মে আশা পোষণ করে যে, তারা এমন কিছু কাজ করবে যা 'আলামে বারযাখের অধিবাসীর উপকারে আসবে। তবে বস্তুজগতের অধিবাসীরা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ স্বপ্নে 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদের কথা শুনতে পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষে শুনতে পাওয়া সম্ভবও হতে পারে)। কিন্তু এ ধরনের শ্রবণকে আক্ষরিক অর্থে বস্তুজগতের অধিবাসীদের শ্রবণ বলে গণ্য করা চলে না। কারণ, বস্তুজগতের মানুষ অর্থাৎ জীবিত মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার নাফ্স্ বস্তুজগতে থাকে না, বরং

তখন তা ‘আলামে বারযাখেরই একটি অংশে অবস্থান করে। (‘আলামে বারযাখের একাধিক তাৎপর্য সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।)

(৪) বস্তুজগতের অধিবাসীরা ‘আলামে বারযাখের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দো ‘আ করলে এবং কোরআন তেলাওয়াত্ করে, নফল নামায আদায় করে ও দান-ছ্বাদাক্বাহ্ করে তার ছাওয়াব্ তাদেরকে দান করলে, তেমনি তাদেরকে ছাওয়াব দানের উদ্দেশ্যে ছ্বাদাক্বায়ে জারীয়াহ্ মূলক কোনো কাজ করলে সে ক্ষেত্রে ‘আলামে বারযাখের সংশ্লিষ্ট অধিবাসীরা তার উপযুক্ত হলে (যেমন : কাফের বা ত্বাগূত্ না হলে) তা থেকে তারা কমবেশী উপকৃত হয় - এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। অন্যদিকে বস্তুজগতের অধিবাসীরা ‘আলামে বারযাখের উপযুক্ত অধিবাসীদের কাছে সুপারিশের জন্য আবেদন জানালে তাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে সুপারিশ তথা দো ‘আ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তা কবূল করলে তা থেকে বস্তুজগতের অধিবাসীরা উপকৃত হয়।

(৫) বস্তুজগতের ও ‘আলামে বারযাখের অধিবাসীরা কেবল আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দো ‘আর মাধ্যমে (ওপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সে শর্তে) পরস্পরকে উপকৃত করতে পারে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে স্বপ্নে পথনির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেও ‘আলামে বারযাখের অধিবাসীরা বস্তুজগতের অধিবাসীদেরকে প্রভাবিত করতে পারে। এর বাইরে দুই জগতের অধিবাসীরা সরাসরি পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(৬) এক জগতের অধিবাসীদের পক্ষে অন্য জগতে সরাসরি হস্তক্ষেপের কোনোই সুযোগ নেই।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন রয়েছে।

'আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আমাদের বস্তুজগত থেকে ভিন্ন মাত্রার একটি জগত। এ কারণেই সাধারণভাবে আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা এ জগতের অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয় না; জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে হয়। এভাবে ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা অনুভব করতে না পারার দৃষ্টান্ত আমাদের বস্তুজগতেরও কতক বিষয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আলো দেখতে পাই না এবং অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাও প্রত্যক্ষ করতে পারি না, কিন্তু কোনো বস্তুতে আলো পতিত হলে তা যখন দেখতে পাই তখন আলোর উপস্থিতি সম্পর্কে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হই। কিন্তু আমরা রঞ্জন রশ্মি (এক্স্-রে), এমনকি তার প্রতিক্রিয়াও, ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও যন্ত্রের সাহায্যে তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়ের অধিকারী হই।

বস্তুতঃ আমরা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রার দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের প্রতিক্রিয়াই প্রত্যক্ষ করতে পারি; এর চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্যের বা কম দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের প্রতিক্রিয়া সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। অনুরূপভাবে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট রেঞ্জের শব্দতরঙ্গ শুনতে পাই; এর চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্যের বা কম দৈর্ঘ্যের শব্দতরঙ্গ শুনতে পাই না। কিন্তু কোনো

কোনো ইতর প্রাণী এমন অনেক আলোকতরঙ্গের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এমন অনেক শব্দতরঙ্গ শুনতে পায় যা মানুষ প্রত্যক্ষ করতে বা শুনতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মৌমাছি যে ধরনের শব্দতরঙ্গের সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে মানুষ তা শুনতে পায় না, তবে এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা অত্যাধুনিক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে কারো কারো পক্ষে এ ধরনের আলোকতরঙ্গ প্রত্যক্ষকরণ ও শব্দতরঙ্গ শুনতে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। আর এ ক্ষমতা যে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাঁর খাছ্ব্ বান্দাহদেরকে দিয়েছেন তা নয়; তিনি চাইলে তা যে কাউকে দিতে পারেন। কয়েক বছর আগে [যদ্দূর মনে পড়ে, সংবাদটা ১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সালের] পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী জনৈকা মহিলার চোখে রঞ্জন রশ্মির মতো ক্ষমতা ছিলো এবং তাঁর দৃষ্টি মানুষের পোশাক ভেদ করে শরীরের ভিতরের, এমনকি পেটের ভিতরের সব কিছু দেখতে পেতো। [মহিলা ছিলেন একটি হাসপাতালের নার্স। বহু বছর আগেকার ঘটনা; যদ্দূর মনে পড়ে, তিনি সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চাকরি করতেন।]

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করলে তাঁর কতক খাছ্ব্ বান্দাহর পক্ষে 'আলামে বারযাখের অবস্থা পুরোপুরি বা আংশিক প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষ করে, আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) মি 'রাজের সময় 'আলামে বারযাখে প্রবেশ করে অন্য নবী-রাসূলগণকে ('আঃ) সহ নামায আদায় করেছিলেন। এছাড়া তিনি

বেহেশতবাসীদের ও দোযখবাসীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন বলে যে বিভিন্ন হাদীছে বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বারযাখী বেহেশত-দোযখের অধিবাসীদের অবস্থা ছিলো।

তবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক 'আলামে বারযাখের অবস্থা প্রত্যক্ষকরণ কেবল মি 'রাজের ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো বলে মনে করা ঠিক হবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর যে কোরআন মজীদ নাযিল করেন তা সর্বপ্রথম একবারে তাঁর হৃদয়ে 'ইলমে হুযূরী আকারে নাযিল করেন - যাতে তখন পর্যন্ত অতীতের সমস্ত ঘটনাবলী এবং পরে অবশ্য ঘটিতব্য ও দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত ঘটনাবলী সব কিছুই শামিল ছিলো, আর তা লেখ্য বা শ্রবণযোগ্য বর্ণনা আকারে নয়, বরং তা হুবহু অভিজ্ঞতার ন্যায়, তবে তাতে কোনো বস্তু ছিলো না - এ যুগের ভিডিও চলচ্চিত্রের ন্যায়। [এ ব্যাপারে কোরআনের পরিচয় ও কোরআনের মু 'জিযাহ্ গ্রন্থ দু'টিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।]

এছাড়া বিভিন্ন হাদীছ থেকে জানা যায় যে, নবী করীম (ছ্বাঃ) মি 'রাজের ন্যায় সরাসরি 'আলামে বারযাখে প্রবেশ না করেও সে জগতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন এবং অনেক সময় সে জগতের অধিবাসীদের সম্বোধন করে কথা বলতেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অতীত হয়ে যাওয়া ঘটনাবলী প্রত্যক্ষকরণের বিষয়টি 'আলামে বারযাখের চলমান ঘটনাবলী প্রত্যক্ষকরণের তুলনায় অধিকতর

কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (ছ্বাঃ)কে তা প্রত্যক্ষ করান অর্থাৎ এ ব্যপারে ‘ইলমে হুযূরী প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)

"(হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি আপনার রব হস্তিমালিকদের সাথে কেমন আচরণ করলেন?" (সূরাহ্ আল্-ফীল্ : ১)

অনেকে অবশ্য এ আয়াতের اَلَمْ تَرَ কথাটির অর্থ "আপনি কি দেখেন নি?" না করে করেন "আপনি কি জানেন না?" কিন্তু এ ধরনের অর্থগ্রহণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন না থাকলে কোনো শব্দের প্রথম অর্থ বাদ দিয়ে অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা চলে না। এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা যদি "আপনি কি জানেন না?" বুঝাতে চাইতেন তাহলে ফাছ্বাহাতের দাবী অনুযায়ী অবশ্যই اَلَمْ تَعلَم বলতেন, اَلَمْ تَرَ বলতেন না।

বিচারবুদ্ধির পক্ষে সহজেই ধারণা করা সম্ভব যে, ‘ইলমে হুযূরী ও ‘আলামে বারযাখের জ্ঞান প্রদানের বিষয়টি কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং অন্যান্য নবী-রাসূলকেও (‘আঃ) তা দেয়া হয়েছিলো। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ) সম্বন্ধে এরশাদ করেন :

(وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)

“আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান সমূহের ও যমীনের মালাকূত্ প্রদর্শন করি - যাতে সে ইয়াক্বীনের অধিকারীদের অন্যতম হয়।” (সূরাহ্ আল্-আন্ ‘আম্ : ৭৫)

এ থেকে অবশ্য হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ)-এর মি ‘রাজ প্রমাণিত হয়। তবে যেহেতু এতে সফর করানোর কথা বলা হয় নি, বরং শুধু ‘প্রদর্শন’ -এর কথা বলা হয়েছে সেহেতু ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ এ মি ‘রাজ ছিলো শুধু আত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে নয়, তথা তাঁকে আসমান সমূহের ও যমীনের মালাকূত্-এর ‘ইলমে হুযূরী প্রদান করা হয়েছিলো। আয়াতের শব্দপ্রয়োগ থেকে সুস্পষ্ট যে, এতে ‘আলামে বারযাখ্ও শামিল ছিলো। আর যেহেতু আয়াতে এ মি ‘রাজের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে ইয়াক্বীনের অধিকারী করা সেহেতু ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এ ধরনের ‘ইলমে হুযূরী কম-বেশী সকল নবী-রাসূলকেই (‘আঃ) প্রদান করা হয়েছিলো।

শুধু নবী-রাসূলগণকেই (‘আঃ) নয়, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর অন্য যে কোনো খাছ্ব্ বান্দাহকেই ‘ইলমে হুযূরী ও ‘আলামে বারযাখের অবস্থা প্রত্যক্ষকরণের ক্ষমতা দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকতে পারেন। বিশেষ করে হযরত ‘আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহ্) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এরশাদ করেন : “পর্দা সরে গেলে নতুন কিছুই আমার সামনে প্রকাশ পাবে না।” অর্থাৎ তিনি ‘আলামে বারযাখের অবস্থা বস্তুজগতের অবস্থার মতোই প্রত্যক্ষ করতেন,

সুতরাং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সামনে নতুন কিছুই প্রকাশ পাবার মতো ছিলো না।

স্বপ্নলোক মূলতঃ 'আালামে বারযাখেরই একটি অংশবিশেষ, যদিও মৃত ব্যক্তিদের নাফসের অবস্থানের অংশ আর স্বপ্নলোক অভিন্ন নয়। এটাকে বস্তুজগতের বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে চাইলেই যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না বা এ সব এলাকার মধ্য থেকে যে কেউ চাইলেই বাইরে যেতে বা বাইরে যোগাযোগ করতে পারে না, তবে অনুমতি সাপেক্ষে কারো পক্ষে শর্তাধীনে বাইরে যাওয়া ও বাইরে থেকে কারো প্রবেশ ও শর্তাধীন সীমিত বিচরণ সম্ভবপর। সুতরাং মানুষের নিদ্রিত অবস্থায় তার নাফসকে যখন 'আালামে বারযাখেরই একটি অংশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে সেখানে বিচরণ করতে দেয়া হয় তখন সেখানে তাকে মৃত ব্যক্তিদের নাফসের মুখোমুখি করা হতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো মৃত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে পথনির্দেশ দিতে পারে বা তার কাছে কিছু চাইতে পারে। এছাড়াও স্বপ্নে মানুষ জীবিত জগতের অনেক কিছুর অনুরূপ বা প্রতীকী অবস্তুগত রূপের মুখোমুখি হতে পারে। ['আালামে বারযাখের একটি অংশে বস্তুজগতের অধিবাসীদের চিন্তা-পরিকল্পনা, কথা ও কাজের অবস্তুগত অনুরূপ বা রূপক রূপ সঞ্চিত হয়। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।]

এছাড়া জীবিত লোকেরা যখন মৃতদেরকে ভালো বা মন্দভাবে স্মরণ করে তখন তা মৃতদের নাফসের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এবং

তাদেরকে আনন্দ বা দুঃখ দেবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনি মৃতরা জীবিতদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে; তাদের এ আনন্দপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট জীবিতদের ওপর ইতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক, ঠিক যেভাবে পার্থিব জগতে দূর থেকে কেউ কাউকে স্মরণ করলে যাকে স্মরণ করা হয় তার ওপর টেলিপ্যাথিক পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। সুতরাং মৃতদের নাফ্‌স্‌ যখন জীবিতদের কাছ থেকে দো 'আ বা দান-ছ্বাদাক্বাহ্‌ কামনা করে অথবা তাদের কল্যাণ কামনা করে বা তাদেরকে পথনির্দেশ দিতে চায় তখন তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সময় জীবিত ব্যক্তিদের মনে হঠাৎ করেই এ ধরনের ভাব জেগে ওঠে যে, মৃত ব্যক্তি তার কাছে দো 'আ বা দান-ছ্বাদাক্বাহ্‌ চাচ্ছে বা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে বা তাকে অমুক পথনির্দেশ দিচ্ছে।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, মৃতদের নাফ্‌স্‌ কি জীবিতদের খুব কাছাকাছি আসতে পারে এবং পারলে জীবিতরা কি তা বুঝতে পারে বা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়?

আমরা ইতিপূর্বে যে আলোচনা করেছি তা থেকে সুস্পষ্ট যে, 'আলামে বারযাখের নাফ্‌স্‌ সমূহ বস্তুজগতে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যবস্থাপনাগত বা প্রত্যক্ষ অনুমতিক্রমে আত্মিক ও জ্ঞানগতভাবে অপেক্ষাকৃত কাছে আসতে পারে, অন্যদিকে আল্লাহর খাছ্ব্‌ বান্দাহ্‌গণ ছাড়াও যে কোনো সাধারণ মানুষও আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহে

কখনো কখনো জাগ্রত অবস্থায়ই 'আালামে বারযাখের অধিবাসীদের অবস্থা অংশতঃ প্রত্যক্ষ করতে পারে বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ জগতের বা এর কোনো অংশের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি আসতে পারে। এ ধরনের অবস্থায় জীবিত ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির নাফসকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও অনুভব করতে পারে; মনে হতে পারে যে, মৃত ব্যক্তি তার আশেপাশেই আছে যদিও সে দেখতে পাচ্ছে না। এ অবস্থা জীবিত ব্যক্তির ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক।

জীবিত মানুষের দেহে মৃতের নাফসের প্রবেশ সম্ভব কি?

বস্তুজগত ও 'আালামে বারযাখের মধ্যে যোগাযোগ প্রসঙ্গে সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো মৃত ব্যক্তির নাফসের পক্ষে কোনো জীবিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ বা তাতে ভর করা সম্ভব কিনা? কারণ, কারো শরীরে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রবেশ করা বা তাতে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা ভর করার দাবী একটি অত্যন্ত পুরনো দাবী। এমনকি, আধুনিক হবার দাবীদার পাশ্চাত্য জগতেও প্লানচেট্ নাম দিয়ে এই একই কাজটি করার দাবী করা হয়।

এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে বলতে হয় যে, কারো নাফসের পক্ষেই অন্য কারো শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে 'আালামে বারযাখের কোনো নাফ্স্ জীবিত জগতে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না, সুতরাং কারো শরীরে প্রবেশ করার বা ভর করার প্রশ্নই আসে না, বিশেষ করে এ কারণেও যে,

একই সময় একটি শরীরে দু'টি নাফ্‌স্‌ থাকতে পারে না। সেই সাথে এ প্রশ্নও আসে যে, কারো শরীরে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ প্রবেশ করে তখন তার নিজের নাফ্‌স্‌ কোথায় থাকে? তা কি তার শরীর থেকে বেরিয়ে যায়? যদি তা-ই হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ যদি আর ঐ শরীর থেকে বের না হয় তো তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে? সুতরাং কোনো জীবিত ব্যক্তির শরীরে কোনো মৃত ব্যক্তির নাফসের প্রবেশের বিষয়টি পুরোপুরি বাত্বিল্‌ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি দেখা দেয় তখনই যখন দেখা দেয় যে, কোনো ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন বা সম্মোহিত অবস্থায় নিজেকে কোনো মৃত ব্যক্তি হিসেবে দাবী করে এমন সব তথ্য প্রদান করে যা ঐ (জীবিত) ব্যক্তির জানার কথা নয়।

প্রকৃত পক্ষে কোনো ব্যক্তি যখন ধ্যানমগ্ন বা সম্মোহিত হয় তখন সে ঘুমন্ত না হলেও জাগ্রত থাকে না। এ ধরনের অবস্থায় তার পক্ষে 'আলামে বারযাখের কোনো না কোনো অংশে প্রবেশ করা সম্ভবপর হতে পারে এবং অতীতের কতক ঘটনাবলী তার কাছে 'ইলমে হুযূরী আকারে প্রকাশ পেতে পারে, আর সে ঐ অবস্থায় অন্যদেরকে তা বলে দিতে পারে। আর ঐ অবস্থায় যেহেতু সে আত্মবিস্মৃত থাকে সেহেতু সে যখন কোনো মৃত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অতীত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে তখন আত্মবিস্মৃতির কারণে অর্থাৎ নিজেকে না দেখা ও ঐ ব্যক্তিকে দেখার কারণে ভুলবশতঃ নিজেকে ঐ ব্যক্তি বলে মনে করতে পারে। জিনে ধরা বা ভর করা বা আছর করার প্রতিক্রিয়াও এ ধরনেরই; জিনে ধরা ব্যক্তির মধ্যে জিন প্রবেশ করে না, বরং

জিন তাকে সম্মোহিত করে এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে জিন বলে মনে করতে পারে।

[সম্মোহিত বা ধ্যানমগ্ন না হয়েও কোনো ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে এরূপ মনে করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে আচরণ করতে পারে। অত্র গ্রন্থকার কৈশোরে এ ধরনের দু'টি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং দু'টিই ছিলো যাত্রাভিনয় সংশ্লিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট অভিনেতা (ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি) অভিনয়ে নিজেকে এতোই আত্মনিবেদিত করে ফেলেছিলেন যে, নিজেকে সেই ব্যক্তি মনে করছিলেন যে চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, ফলে অভিনয়ের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু শেষ হওয়ার পরেও মূল চরিত্রের ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত, উভয় ক্ষেত্রেই অন্যরা সংশ্লিষ্ট অভিনেতাকে মঞ্চ থেকে নিয়ে যায় এবং একটি ক্ষেত্রে অভিনেতা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন।]

কোরআন মজীদে ও দর্শনে 'আালামে বারযাখের তাৎপর্য

এমন অনেক পরিভাষা আছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রতিটি শাস্ত্রে তার নিজস্ব তাৎপর্য আছে। ফলে অনেক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখার সাথে পরিচিত ব্যক্তি তার জানা একটি পরিভাষা অন্য একটি শাস্ত্রে তার জানা সংজ্ঞা ও অর্থ থেকে ভিন্ন একটি সংজ্ঞা ও অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখে ঐ সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়তে পারেন। তবে ব্যক্তি যদি পরিভাষাটির বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের সাথে পরিচিত থাকেন তাহলে তিনি এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন না।

অন্য কথায় বলা চলে যে, লেখা ও শোনার দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত অভিন্ন পরিভাষা, এমনকি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হলেও, ব্যবহারিক তাৎপর্যের বিচারে তা অভিন্ন শব্দ বা পরিভাষা নয়। বরং এগুলো হচ্ছে সমুচ্চারিত ও সমরূপে লেখ্য ভিন্নার্থক শব্দ ও পরিভাষা। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অভিন্ন হলেও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান তাতে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন পারিভাষিক তাৎপর্য আরোপ করেছে, ফলে কার্যতঃ তা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, "শাহীদ" পরিভাষাটি কোরআন মজীদে ও প্রচলিত পরিভাষায়

সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রূহ্, নাফ্স্, বারযাখ্ ইত্যাদি পরিভাষাও এ পর্যায়ের; কোরআন মজীদে, দর্শনে ও 'ইরফানে (তাছ্বাওওফে) এ সব পরিভাষা নিজস্ব বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি সাধারণ মানুষও এ সব পরিভাষা থেকে কতোগুলো সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

অত্র গ্রন্থের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, আমরা 'আ্যালামে বারযাখ্ পরিভাষাটি কোরআন মজীদে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কেবল সে অর্থেই ব্যবহার করেছি, তা হচ্ছে, মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী নাফসের জগত। (অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে স্বপ্নের জগতের কথাও উল্লেখ করেছি, তবে তা-ও কোরআনের দলীলের ভিত্তিতে।)

দর্শনশাস্ত্রে একই পরিভাষা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দর্শনে 'আ্যালামে বারযাখ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সেই সব সৃষ্টির জগত যে সব সৃষ্টি বস্তুগত সত্তাও নয়, আবার নিরঙ্কুশ নিরাকার অবস্তুগত সত্তাও নয়। বরং তারা হচ্ছে এক ধরনের সূক্ষ্ম সত্তা (موجود لطيف)। এ সব সত্তার আকার-আকৃতি ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু তা বস্তুগত অস্তিত্ব নয়, বরং সূক্ষ্ম সত্তা। আবার অনেক দার্শনিক সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে উক্ত জগতের সৃষ্টিসমূহকে 'সূক্ষ্ম পদার্থ' (مادة لطيف) দ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টিনিচয় বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁরা সাথে সাথেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ সব সৃষ্টি বস্তুগত সৃষ্টি নয়।

বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এর কাছাকাছি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন : তাপ, আগুন, বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই রয়েছে। কিন্তু পদার্থ বা বস্তু থেকে উৎপন্ন হলেও এগুলো পদার্থ বা বস্তুর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, বরং এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শক্তি। অবশ্য এগুলো নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানেই আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য এটাই যে, এগুলো পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র; অবশ্য এগুলোকে সূক্ষ্ম পদার্থ বলা যেতে পারে। এগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে - যা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বস্তুগত ও অবস্তুগত অস্তিত্বের মাঝামাঝি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব রয়েছে। আর প্রাণহীন সূক্ষ্ম অস্তিত্ব যখন রয়েছে তখন প্রাণশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সূক্ষ্ম অস্তিত্ব থাকতে কোনো বাধা নেই।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, আমদের বস্তুজগতেও হাল্কা শরীরের দৃষ্টান্ত রয়েছে - যা সূক্ষ্ম অস্তিত্ব না হলেও সূক্ষ্মতার কাছাকাছি। আগুন বা আলোর দ্বারা গঠিত প্রাণশীল সৃষ্টির বিষয়টি অনেকের পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন এ সব উপাদানের অণুসমূহের গতিশীলতা ও এ ধরনের শরীরের স্থিতিস্থাপকতার কারণে। কিন্তু জেলি ফিশের শরীরের পেশীগুলো যেমন হাল্কা তেমনি সেগুলোর মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, এ কারণে সেগুলোর শরীর খুবই স্থিতিস্থাপক। বলা হয় যে, একটি বড় আকারের ছুরি দ্বারা একটি জেলি

ফিশের শরীরকে কেটে ফেললেও তা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। শামুকের শিং দু'টিও অতোটা না হলেও যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক।

বস্তুতঃ প্রাণশীল ও প্রাণহীন নির্বিশেষে বস্তুনিচয়ের পদার্থগুলোকে আমরা ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ বলে মনে করলেও প্রকৃত পক্ষে এ সবের অণুগুলোর মধ্যে এতোই ফাঁক যে, বলা হয়, গোটা পৃথিবীকে পুরোপুরি ঘনসংবদ্ধ করা সম্ভব হলে তা একটি ব্রিফকেসে রাখা যাবে। কিন্তু এতো ফাঁক সত্ত্বেও বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণী যে তাদের বস্তুগত আকৃতি ও দেহকাঠামোর অধিকারী আছে তার কারণ এগুলোর অণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং বাইরে থেকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্ন করা না হলে এগুলো বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম পদার্থের তৈরী স্থিতিস্থাপক দেহের অধিকারী প্রাণশীল সৃষ্টির অস্তিত্ব (যেমন : জিন ও ফেরেশতা) থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক আচরণ বৈ নয়।

যা-ই হোক, "শাইখুর্ রাঈস্" নামে খ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবূ 'আলী ইবনে সীনা তাঁর কিতাবুল্ আসফার্ গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯) বলেছেন, 'আলামে বারযাখ্ কথাটির অর্থ কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয় মত্যুর পূর্ববর্তী এবং হাশর ও ক্বিয়ামতের পূর্ববর্তী জগত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অর্থ 'আলামে মাছালে মু 'আল্লাক্বাহ্ (মাঝামাঝি ধরনের সদৃশ জগত) এবং সর্বোপরি এর অর্থ হচ্ছে নিরঙ্কুশ অবস্তুগত জগত (عالم

مجردات محض) ও শরীরী বা বস্তুগত জগতের মাঝামাঝি একটি জগত। একেই 'আলামে বারযাখ্ বলা হয়। (فرهنگ معارف اسلامی، مدخل: عالم برزخ)

'আলামে বারযাখের দার্শনিক সংজ্ঞা ও কোরআন মজীদে বর্ণিত 'আলামে বারযাখের অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী ও পুনরুত্থানপূর্ববর্তী জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকে মনে করেন যে, মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্তুগত নাফসকে একটি সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিয়ে 'আলামে বারযাখে রাখা হয়; অনেকে এটিকে "জিসমে মিছালী" (সদৃশ শরীর) নামকরণ করেছেন। এ মতের সপক্ষে অবশ্য কোরআন মজীদের কোনো দলীল নেই। অন্যদিকে এরূপ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আসলে নাফ্স্ নিরঙ্কুশ অবস্তুগত (مجرد محض) অস্তিত্ব নয়, বরং তা হচ্ছে এক ধরনের সূক্ষ্ম সত্তা বা আলোর সত্তা - যা দেখতে হুবহু বস্তুদেহের অনুরূপ, তবে তাতে জড়বস্তু নেই এবং মানুষ ও অন্য যে কোনো প্রাণীর জীবিত অবস্থায় তা তার গোটা জড়দেহ জুড়ে অবস্থান করে।

কিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীর, এমনকি উদ্ভিদেরও এ ধরনের আলোর শরীর ধরা পড়েছে; এমনকি মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হলেও তার আলোর শরীরে সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে বহাল থাকে। তবে এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না যে, এ আলোর দেহই নাফ্স্, বরং এ-ও হতে পারে যে, নাফ্স্ একই সাথে বস্তুদেহ ও

আলোর দেহের অধিকারী এবং মৃত্যুর সময় নাফসকে তার আলোর শরীর তথা মিছালী শরীর সহই 'আলামে বারযাখে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে, যেহেতু মানুষ যে বয়সে যে ধরনের শারীরিক কাঠামো সহকারে মারা যায় তার এ আলোর দেহ সে আকারেরই হয়ে থাকে - যা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার আলোর দেহও বড় হয়, সেহেতু ঐ আলোর দেহই নাফ্স্ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নইলে ঘুমিয়ে পড়লে একজন মানুষকে একেক বয়সে একেক আকারের আলোর দেহে বা মিছালী শরীরে প্রবেশ করিয়ে 'আলামে বারযাখে নিতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট মিছালী শরীর থাকার ধারণাটি বাত্বিল্ হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে রূহ্, নাফ্স্, প্রাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে।

রূহ্ ও নাফ্স্ এবং জিসমে মিছালী

মানুষ শুধু একটি বস্তুদেহের নাম নয়, বরং তার মধ্যে বস্তুদেহ ছাড়াও অবস্তুগত সত্তা রয়েছে - এ এক অনস্বীকার্য সত্য। তথাপি বস্তুবাদী নাস্তিক চিন্তাবিদরা দাবী করেন যে, মানুষের চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখ ও আবেগ-অনুভূতির ন্যায় বিষয়গুলো শুধুই বস্তুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তথা মস্তিষ্কের নিউরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র; মৃত্যুতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার অবসান ঘটে।

বস্তুবাদীদের এ মত নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার মতো অবকাশ নেই এবং তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, এ এক দীর্ঘ বিতর্কের বিষয় - যার সাথে এ জীবন ও জগতের উৎস তথা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সংক্রান্ত আলোচনা সম্পৃক্ত এবং এ ব্যাপারে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি।

তাদের জবাবে আপাততঃ এখানে আমরা এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে মনে করি যে, এমনকি উন্নততম বস্তুগত যন্ত্রের কর্মতৎপরতাও একমুখী এবং সৃজনশীলতাবিহীন। উন্নততম বস্তুগত যন্ত্রের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুপার কম্পিউটার, কিন্তু সুপার কম্পিউটার কেবল সে কাজই আঞ্জাম দেবে যে কাজের জন্য তাকে প্রোগ্রাম দেয়া হয়েছে। এমনকি আমরা অনেক সময় তার মধ্যে যে নির্বাচনক্ষমতার পরিচয় পাই তা-ও তার মধ্যে প্রদত্ত কর্মসূচীরই ফল। সে তার মধ্যে প্রদত্ত কর্মসূচীর বাইরে নিজে নিজে কোনো মৌলিক বা স্বাধীন কর্মসূচী তৈরী করতে ও তা কাজে লাগাতে পারে না, বিশেষ করে যার অস্তিত্ব নেই এমন কিছু কল্পনা করতে পারে না।

এ ব্যাপারে একটি চমৎকার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, একটি সাধারণ কম্পিউটারকেও বহু সংখ্যা বিশিষ্ট, ধরুন, পঞ্চাশ সংখ্যা বিশিষ্ট, জটিল ধরনের একটি অঙ্ক কষতে দিলে সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার জবাব দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু একটি উন্নততম সুপার কম্পিউটারকে - যার মেমোরিতে প্রচুর ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতা সঞ্চিত রয়েছে, পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ছোটগল্প থেকে এক পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্তসার পেশ করতে বললে সে

কিছুতেই তা পারবে না, অথচ সাত বছরের একটি শিশু তা করতে পারবে। আর তাকে (সুপার কম্পিউটারকে) যদি মাত্র দুই ছত্রের একটি কবিতা রচনা করতে বলা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও সে অক্ষমতা পেশ করবে।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীদেহে, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে এক বা একাধিক বস্তু-উর্ধ সত্তা রয়েছে যা বস্তুগত অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। সুতরাং এখানে আমরা মানুষের মধ্যে বস্তু-উর্ধ সত্তার অস্তিত্বের বিষয়টি অকাট্য ধরে নিয়ে আলোচনা করবো।

এ ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রশ্ন আছে যে, মানুষ সহ প্রাণীদেহের মধ্যকার বস্তু-উর্ধ সত্তা কি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপ্রকৃতির বিধান অনুযায়ী শরীর গঠনের একটি পর্যায়ে তাতে তৈরী হয়, নাকি সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাতে যোগ করা হয় তা এক স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়, কিন্তু প্রাণীদেহে স্বতন্ত্র বস্তু-উর্ধ সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। [তবে তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যোগ করার ধারণা যদি সঠিকও হয়ে থাকে তথাপি যারা মনে করেন যে, হযরত আদম ('আঃ)কে পৃথিবীতে পাঠোনোর আগেই তাঁর বংশধর সকল মানুষের নাফ্স্ সৃষ্টি করা হয়েছিলো তাঁদের সে ধারণা ঠিক নয়। কারণ, সংশ্লিষ্ট আয়াতে (সূরাহ্ আল্-আ 'রাফ্ : ১৭২) হযরত আদম ('আঃ)-এর সন্তানদের বংশধরদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।]

যা-ই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে বস্তু-উর্ধ সত্তা রয়েছে তার বা সেগুলোর সংখ্যা ক' টি এবং স্বরূপ কী?

এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা সহজবোধগম্য, কিন্তু এ ব্যাপারে দার্শনিক ও 'ইরফানী মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং তার মধ্যে কোনটি কোরআন-সম্মত, নাকি কোরআন মজীদ থেকে তৃতীয় কোনো মত পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব মিলে না। অন্যদিকে দার্শনিক ও 'আারেফগণের মতামত যেমন জটিল তেমনি তাঁদের মধ্যে বহুমুখী মতপার্থক্য রয়েছে - যার বিস্তারিত উদ্ধৃতি থেকে এমনকি বিশেষজ্ঞগণের পক্ষেও একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়া কঠিন ব্যাপার। তাই এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে এবং এমনভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন যা বুদ্ধিবৃত্তিকদের পক্ষে সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে, মানুষ শরীর ও রূহ্ বা আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য - যারা নিঃসন্দেহে দর্শন, 'ইরফান্ ও 'উলূমে ইলাহীয়াত্-এ বিশেষজ্ঞ নন - এই রূহ্ বা আত্মার হাক্বীক্বাত্ বা স্বরূপকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা চলে : "আত্মা হচ্ছে ব্যক্তির দেহজুড়ে অবস্থানরত ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী

হবার এবং সবল ও দুর্বল মাত্রার হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন বস্তু-উর্ধ যৌগিক সত্তা।
”

যদিও এ সংজ্ঞা বিতর্কাতীত নয়, তবে বিতর্কাতীত না হলেও কেবল এ সংজ্ঞা সহকারেই ‘মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টি’ - এ মতকে সঠিক ধরে নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য ‘ইরফান্‌, দর্শন ও কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে বিষয়টি হুবহু এরূপ নয় অর্থাৎ মানুষ একটিমাত্র বস্তুদেহের অধিকারী হলেও একটিমাত্র বস্তু-উর্ধ অস্তিত্বের অধিকারী নয়। আর এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা আমাদের সংজ্ঞায় “রূহ্‌” পরিভাষা ব্যবহার না করে “আত্মা” পরিভাষা ব্যবহার করেছি এবং এতে ‘যৌগিক’ বিশেষণ যোগ করেছি।

অবশ্য এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, এ ব্যাপারে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা কোনো গুরুতর ব্যাপার নয়। কারণ, একই পরিভাষা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন তাৎপর্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ্যে প্রচলিত পরিভাষায় “ছ্বালাত্‌” মানে “নামায”, কিন্তু কোরআন মজীদের পরিভাষায় “ছ্বালাত্‌” মানে কখনো “দো ‘আ/ দুরূদ্‌” ও কখনো “নামায” । এ কারণেই যখন হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর প্রতি “ছ্বালাত্‌” প্রেরণ করতে বলা হয় তখন শব্দগত অভিন্নতা সত্ত্বেও তা থেকে “নামায” বুঝায় না, “দুরূদ্‌” বুঝায়। অনুরূপভাবে দর্শনে “ওজূদ্‌” বলতে বস্তুগত ও অবস্তুগত নির্বিশেষে ‘অস্তিত্ব’ বুঝায়, কিন্তু তাছ্বাওওফে “ওজূদ্‌”

বলতে ‘বস্তুদেহ’ কে বুঝানো হয়। একইভাবে সাধারণ মানুষ যখন বলে যে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট, তখন তাতে ‘আত্মা’ একক, নাকি যৌগিক এবং যৌগিক হলে সে যৌগিকতা সত্তাগত, নাকি গুণগত, নাকি মাত্রাগত তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে বস্তুদেহ ছাড়াও অবস্তুগত সত্তা রয়েছে এটাই বুঝানো হয়। অতএব, এ দৃষ্টিতে এ মতকে ভুল বলা চলে না।

কিন্তু বিশেষজ্ঞত্ব পর্যায়ে মানবদেহে বিদ্যমান বস্তু-উর্ধ অস্তিত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশেষজ্ঞগণের অনেকে মানবদেহে একাধিক বস্তু-উর্ধ অস্তিত্বের সন্ধান পান - যেগুলোর মধ্য থেকে তাঁরা একটিকে “রূহ্” বলে অভিহিত করে থাকেন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ “রূহ্” (আত্মা) বলতে যা বুঝায় এখানে “রূহ্” পরিভাষাটি তা থেকে স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে। সুতরাং যারা ‘শরীর ও রূহ্/আত্মা’ র কথা বলছেন তাঁরা মানবদেহে “নাফ্স্” বা অন্যান্য অবস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, তাঁরা শরীর বাদে মানব-অস্তিত্বের গোটা বস্তু-উর্ধ দিককেই রূহ্ বা আত্মা বলে থাকেন।

তথাপি এ ব্যাপারে অধিকতর বিস্তারিত ধারণায় উপনীত হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে, কারণ, ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তারিত ধারণা না থাকার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা কোরআন মজীদে বলেছেন যে, তিনি হযরত আদম (‘আঃ)-এর মধ্যে স্বীয় রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন, আর

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা কোনো শরীরী সত্তা নন, সেহেতু অনেকে মনে করে নিয়েছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই আদম ('আঃ)-এর শরীরে প্রবেশ করেছেন। অনুরূপভাবে কোরআন মজীদে হযরত 'ঈসা ('আঃ) সম্বন্ধে বলেছেন : روح منه - "তাঁর (আল্লাহর) রূহ্" - এ থেকে খৃস্টানরা দাবী করে যে, কোরআনের মত অনুযায়ী হযরত 'ঈসা ('আঃ)ই খোদা (না 'উযূ বিল্লাহ্)।

কোরআন মজীদে "রূহ্" কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আদৌ ধারণা না থাকার কারণেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি। কোরআন মজীদে অন্য আয়াতে যেখানে "রূহ্" কে আল্লাহর কাজ বা আদেশ (امر) বলা হয়েছে - এ নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, "আল্লাহর রূহ্" মানে স্বয়ং আল্লাহ্ নন।

যা-ই হোক, মানুষের মধ্যকার অবস্তুগত অস্তিত্বের প্রকৃত সংখ্যা ও স্বরূপ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ও বিতর্কাতীত উপসংহারে উপনীত হওয়া হয়তো আপাততঃ সম্ভব হবে না, তবে এ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা বহুলাংশে দূর করা যেতে পারে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এ ব্যাপারে কোরআন মজীদ থেকে যে ধারণা পাওয়া যাবে সে ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক ধারণা পোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারবো।

মানুষের মধ্যকার অবস্তুগত অস্তিত্ব কি একটি নাকি একাধিক এবং তা কী বা সেগুলো কী কী - এ ব্যাপারে দর্শন, 'ইরফান্ ও ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন মতকে নিম্নলিখিত কয়েকটি মতে সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে :

(১) একটিমাত্র অবস্তুগত সত্তা : রূহ্ বা আত্মা। এ ক্ষেত্রে তা একক, নাকি যৌগিক এবং যৌগিক হলে তার যৌগিকতা কি সত্তাগত, নাকি গুণগত, নাকি মাত্রাগত তা বিবেচ্য নয়।

(২) দু'টি অবস্তুগত সত্তা : প্রাণ এবং রূহ্ বা আত্মা।

(৩) দু'টি অবস্তুগত সত্তা : জীবাত্মা (روح حیوانی) ও মানবাত্মা (روح انسانی)।

(৪) দু'টি অবস্তুগত সত্তা : রূহ্ ও নাফ্স্।

(৫) তিনটি অবস্তুগত সত্তা : জীবসত্তা, প্রাণ এবং রূহ্ বা আত্মা।

(৬) তিনটি অবস্তুগত সত্তা : প্রাণ, নাফ্স্ ও রূহ্।

(৭) চারটি অবস্তুগত সত্তা : জীবসত্তা, প্রাণ, রূহ্ ও নাফ্স্।

(৮) প্রাণ, রূহ্ ও নাফ্স্ ছাড়াও একটি অবস্তুগত শরীর রয়েছে - মৃত্যুর সময় নাফসকে এ শরীর সহকারে 'আলামে বারযাখে নিয়ে যাওয়া হয়।

যারা প্রতিটি প্রাণী বা জীবে একটিমাত্র অবস্তুগত অস্তিত্ব তথা রূহ্ বা আত্মা আছে বলে মনে করেন তাঁরা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ের বা স্তরের রূহের কথা বলেন - যার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে সজীব বস্তু বা উদ্ভিদ এবং সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে মানুষ। এতদুভয়ের মাঝখানে বিভিন্ন স্তরে রয়েছে রোগজীবাণু থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, জলচর প্রাণী, সরীসৃপ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে স্তরগত দিক থেকে উচ্চতর ও

নিম্নতর রয়েছে। তেমনি যারা প্রাণ ও আত্মা নামে দু'টি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রবক্তা তাঁরাও এতদুভয়ের বিভিন্ন স্তরের প্রবক্তা।

আবার অনেকে মনে করেন, আসলে মানুষ বা প্রাণীকুলের মধ্যে স্বতন্ত্র কোনো বস্তু-উর্ধ সত্তা নেই, বরং সমগ্র সৃষ্টিলোকে একটিমাত্র রূহ্ রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটিমাত্র রূহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে তা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে; এ প্রতিবিম্ব সরে গেলেই মানুষ বা প্রাণীর মৃত্যু হয়।

অনেকে মনে করেন, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে রূহানী বা আত্মিক সত্তা আছে, তবে তা নির্গুণ। উর্ধলোকে বিভিন্ন ধরনের রূহানী বা আত্মিক সত্তা আছে; মানুষ ও প্রাণীকুলের ভালো-মন্দ গুণাবলী হচ্ছে উক্ত রূহানী বা আত্মিক সত্তাসমূহের প্রভাবেরই ফল।

মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি প্রাণীর, বিশেষতঃ মানুষের রূহ্ বা নাফ্স্ স্বতন্ত্র ও পূর্ব থেকে সৃষ্ট - যা শরীর গঠনের এক পর্যায়ে তাতে প্রবেশ করানো হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় শরীর গঠনের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে নাফ্স্ সৃষ্টি হয় ও ক্রমবিকশিত হয় অর্থাৎ শরীরে প্রাণের উদ্ভবের পরে নাফসের উদ্ভব হয়, তবে বস্তুদেহ থেকে উদ্ভূত হলেও তা অবস্তুগত, ঠিক যেভাবে বস্তু থেকে সৃষ্ট শক্তি (যেমন : বিদ্যুত) বস্তু থেকে স্বতন্ত্র ধরনের অস্তিত্ব অর্থাৎ এক ধরনের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব।

যে সব দার্শনিক অবস্তুগত দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের কথা বলেছেন তাঁরা মনে করেন যে, অবস্তুগত নাফ্স্ কোনো না কোনো ধরনের দেহ ছাড়া অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এ সূক্ষ্ম দেহ কি বস্তুদেহের ভিতরেই অবস্থান করে, নাকি মৃত্যুর সময় বাইরে থেকে এ সূক্ষ্ম দেহ এনে নাফসকে তাতে প্রবেশ করিয়ে 'আলামে বারযাখে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এ সূক্ষ্ম দেহ যদি বাইরে থেকেও আনা হয় তো সে ক্ষেত্রেও তা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ কারণেই 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চেনা যায় অর্থাৎ তারা পার্থিব জগতে দেখতে যেমন 'আলামে বারযাখেও তেমনি, কেবল তাতে বস্তু থাকে না, ঠিক আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো।

তাঁরা এ ব্যাপারে স্বপ্নের উদাহরণ দিয়েছেন; ঘুমের সময় মানুষের নাফ্স্ তার শরীরে থাকে না, কিন্তু স্বপ্নে মানুষ নিজেকে জাগ্রত অবস্থার অনুরূপ দেখতে পায় অর্থাৎ ঘুমের সময় নাফ্স্ তার সূক্ষ্ম দেহ সহকারে বস্তুদেহ থেকে বেরিয়ে যায়, মতান্তরে, বস্তুদেহ থেকে বেরিয়ে সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করে। এ সূক্ষ্ম দেহকে جسم مثالى (জিসমে মিছালী - সদৃশ দেহ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

যারা মনে করেন যে, সদৃশ দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ নাফ্স্ সহ বস্তুদেহে অবস্থান করে না বরং তা স্বতন্ত্র, তাঁদের মতে, মৃত্যুর সময় নাফসকে বস্তুদেহ থেকে

বের করে এতে প্রবেশ করিয়ে ‘আলামে বারযাখে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুনরুত্থানের সময় তা থেকে বের করে নবসৃষ্ট বস্তুদেহে প্রবেশ করানো হবে। বিশেষ করে মানুষ বিভিন্ন বয়সে যখন স্বপ্ন দেখে তখন তাতে নিজেকে সাধারণতঃ সে বয়সেরই দেখে থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তার সদৃশ শরীরেরও বয়স বৃদ্ধি পায় এবং এটা প্রমাণ করে যে, তার এ সূক্ষ্ম দেহ মৃত্যুর সময় বাইরে থেকে (‘আলামে বারযাখ্ থেকে) আনা হয় না, বরং এ সদৃশ দেহ সহই নাফ্স্ বস্তুদেহে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর সময় তদ্‌সহই বের করে নেয়া হয়।

আরো একটি কারণে এই শেষোক্ত মতটি সঠিক বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, মানুষের মৃত্যুর সময় তার সদৃশ দেহ যদি বাইরে থেকে এনে নাফসকে তাতে প্রবেশ করানো হয় এবং পুনরুত্থানের সময় যদি পুনরায় তা থেকে বের করে নবসৃষ্ট বস্তুদেহে প্রবেশ করানো হবে, তাহলে অতঃপর ঐ সদৃশ দেহ কী কাজে লাগবে? কারণ, পুনরুত্থানের পর মানুষ যে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে তাতে না মৃত্যু থাকবে, না থাকবে স্বপ্ন। সুতরাং মানুষের জন্য ঐ সদৃশ দেহের আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। এমতাবস্থায় তা কী কাজে লাগবে?

এর একটাই সমাধান। তা হচ্ছে, সদৃশ দেহ বাইরে থাকে না, বরং নাফ্স্ সদৃশ দেহ সহকারেই বস্তুদেহে অবস্থান করে, ঘুমের মধ্যে ও মৃত্যুকালে

তদ্‌সহই তাকে বের করে নেয়া হয় এবং পুনরুত্থানের সময় তদ্‌সহই তাকে নবসৃষ্ট বস্তুদেহে প্রবেশ করানো হবে।

কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, তা হচ্ছে : এই সদৃশ দেহ কি স্বতন্ত্র কিছু, নাকি এটাই নাফ্‌স্‌? বিশেষ করে কোরআন মজীদে নাফ্‌স্‌-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু জিসমে মিছালী-র কথা উল্লেখ নেই। এ থেকে মনে হয়, এই সদৃশ দেহই নাফ্‌স্‌।

কিরলিয়ান্ ফটোগ্রাফির আলোর শরীর

মানুষের এ সূক্ষ্ম দেহের বিষয়টি বিজ্ঞানের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। কিরলিয়ান্ ফটোগ্রাফি-তে শুধু মানুষের নয়, প্রতিটি সজীব অস্তিত্বেরই একটি আলোর দেহ রয়েছে বলে ধরা পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এটাই কি সদৃশ দেহ? অথবা এটাই কি নাফ্‌স্‌?

কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ক্রাসনোদার্ শহরের তুখোর বিদ্যুতবিজ্ঞানী সেমিওন্ দাভিদোভিচ্ কিরলিয়ান ১৯৩৯ সালে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি জীবিত শরীর এবং তার যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশ থেকে এক ধরনের আলোকরশ্মি বের হয়ে থাকে। তিনি ও মিসেস কিরলিয়ান এর ছবি তুলতে সক্ষম হন। তাঁরা আরো প্রমাণ করেন যে, এই আলো অসুস্থতা ও মৃত্যুর পূর্বাভাস দিতে পারে। তা হচ্ছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ধরা না পড়লেও, যার শরীরে রোগের উপাদান প্রবেশ করেছে ও শীঘ্রই সে

রোগাক্রান্ত হতে বা মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তার শরীর থেকে বহির্গত আলো ম্লান হয়ে থাকে।

কিরলিয়ান দম্পতি ছাড়াও মার্কিন মহিলা সাইকিক এলিন গ্যারেটও মানুষসহ সকল প্রাণীর দেহের চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন আলোর আভা লক্ষ্য করেন। এর আগে খৃস্টীয় ১৯০০ অব্দের প্রথম দিকে লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালের ড. ওয়াল্টার কিলনার্ লক্ষ্য করেন যে, ডিসাইয়ানিন ডাই রঞ্জিত কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালে মানুষের দেহের চারপাশে উজ্জ্বল আলোর একটা আভা দেখতে পাওয়া যায়। শরীরের চারপাশে ছয় থেকে আট সেন্টিমিটার জায়গা জুড়ে এ আভা মেঘের মতো ভাসছে। এছাড়া এক শতাব্দীকাল পূর্বে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ ব্যারোন্ ভন্ রিচেনবাখ্ গবেষণা করে বলেছিলেন যে, মানুষ, গাছপালা ও পশুপাখীর শরীর থেকে এক ধরনের জ্যোতি বের হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ড. আলেকজান্ডার গুরভিচ আবিষ্কার করেন যে, জীবন্ত সব কিছু থেকেই এক ধরনের শক্তি আলোর আকারে বের হয় যা দেখা যায় না। তিনি প্রমাণ করেন যে, পিয়াযের একটি শিকড় কীভাবে দূর থেকে অন্য একটি শিকড়ে আলো বিকিরণ করে তার কোষসংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। (কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি : কবির আশরাফ, রহস্য পত্রিকা, জুন ১৯৮৫ - Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain গ্রন্থ অবলম্বনে।)

এ থেকে কারো মনে হতে পারে যে, উক্ত বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার বোধ হয় স্রেফ বিশেষ ধরনের আলো যা সাধারণভাবে চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা শরীর থেকে নির্গত নেহায়েত আলোমাত্র নয় যা অনবরত বেরোচ্ছে ও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য আলোর ন্যায় হারিয়ে যাচ্ছে। বরং এটা হচ্ছে এক ধরনের স্থির আলো যা শরীরকে ঘিরে অবস্থান করছে যদিও তার কিছুটা রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এটা শরীর থেকে নির্গত আলোমাত্র নয়, বরং এ হচ্ছে শরীরকে ঘিরে বা শরীর জুড়ে এক আলোর শরীর। কেননা "কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি প্রমাণ করেছে যে, মানুষের হাত বা পা কেটে ফেললেও তার আলোর হাত বা পা সেখানে রয়ে যায়।" (প্রাগুক্ত)

এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কিরলিয়ান দম্পতি যা আবিষ্কার করেন তা শরীর থেকে নির্গত আলো নয়, বরং তা হচ্ছে আলোর শরীর। আরো অনেক বিজ্ঞানী এ ধারণা সমর্থন করেছেন।

"অনেক গবেষণার পর ইনুশিন্, গ্রিশ্চেংকো ও অন্য কয়েক জন রুশ বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীরই রয়েছে একটি দ্বিতীয় শরীর বা প্রতিদেহ (counter-body) যা সম্পূর্ণ বায়বীয়, ইথারীয় ও আলোকময়। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন Biological Plasma body; এটাই হচ্ছে আসল শরীর যার মধ্য দিয়ে 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তি চলাচল করে। যে সমস্ত ভারতীয় যোগী দাবী করেন যে, তাঁরা নিজের শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারেন, সম্ভবতঃ

তাঁদের এই আলোর দেহটিই 'ভৌত শরীর' থেকে বের হয়ে যায়। তাঁদের ইচ্ছা মতো সেটা আবার দেহে ফেরত আসে।" (প্রাগুক্ত)

বলা বাহুল্য যে, এটা আলোমাত্র হলে দেহের কর্তিত অঙ্গের শূন্যস্থানে আলোর অঙ্গ থাকতো না। অতএব, এটা যে, একটি অবস্তুগত দেহ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের বস্তুগত দেহের অভ্যন্তরে বা দেহকে ঘিরে বা দেহজুড়ে কি কেবল এই একটিমাত্র অবস্তুগত আলোর দেহ রয়েছে, নাকি আরো কোনো অস্তিত্ব রয়েছে যা কিরলিয়ান ফটোগ্রাফিতেও ধরা পড়ে নি? এরূপ থাকতেও পারে। আর যদি না-ই থাকে তো বলতে হবে যে, এই আলোর দেহটাই মানুষের প্রাণ বা প্রাণের মূল কারণ তথা এটাই ব্যক্তিসত্তা বা নাফ্‌স্।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, আমরা ইতিপূর্বে যে সব অবস্তুগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি অর্থাৎ আগুন, শক্তি, আলো, বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্র, সেগুলো অবস্তুগত অস্তিত্ব হলেও প্রাণ বা প্রাণের বাহক নয়। কিন্তু কিরলিয়ান দম্পতি যা আবিষ্কার করলেন তা হচ্ছে প্রাণ বা প্রাণের বাহক। অর্থাৎ পর্যায় ও মর্যাদাগত দিক থেকে এটি উচ্চতর অবস্তুগত অস্তিত্ব। এমতাবস্থায় অনুরূপ উচ্চতর অবস্তুগত অস্তিত্ব, যেমন : জিন্ ও ফেরেশতার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বলার কোনো উপায় নেই, যদিও আরো উচ্চতর হবার কারণে তাকে বস্তুবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে নাফ্‌স্‌

কোরআন মজীদে হায়াত্‌ (জীবন), নাফ্‌স্‌ (ব্যক্তিসত্তা) ও রূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও কোরআন মজীদে এর স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। বলা হলে তৎকালীন মানুষদের বোধগম্য হতো না, বরং কোরআন মজীদের ঐশিতা প্রশ্নবিদ্ধ হতো। হয়তো এ কারণেই এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি (আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)। এ সম্পর্কে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে প্রশ্ন করা হলে তার জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন মজীদে এরশাদ করেন :

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا)

"(হে রাসূল!) তারা আপনাকে রূহ্‌ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি বলুন : রূহ্‌ হচ্ছে আমার রবের আদেশ (বা কাজ) এবং তোমাদেরকে 'ইলম্‌ থেকে সামান্য বৈ দেয়া হয় নি।" (সূরাহ্‌ আল্‌-ইসরা' / বানী ইসরাঈল্‌ : ৮৫)

আরবী ভাষায় "রূহ্‌" শব্দটি বিভিন্ন অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় - যা প্রাণহীন জড় পদার্থের বেলায় প্রযোজ্য নয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে শারীরিক অনুভূতি, যেমন : বলা হয়, নখ, দাঁত, হাড় ও চুলে রূহ্‌ (অনুভূতি) নেই। এর অন্য একটি অর্থ হচ্ছে মানসিক চেতনা, যেমন : আমরা বলি, খোদায়ী চেতনা, শয়ত্বানী চেতনা, আদর্শিক চেতনা ইত্যাদি। ওপরের আয়াতে যে "রূহ্‌" সম্পর্কে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সম্ভবতঃ মানুষের

মধ্যকার সেই মানবিক চেতনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর অনুরূপ গুণাবলী (যদিও অপূর্ণ মাত্রায়) এবং এটাই খোদায়ী চেতনা। এ খোদায়ী চেতনার কারণেই মানুষ বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্), ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং সে তা কাজে লাগাতে পারে।

কোরআন মজীদে হযরত আদম ('আঃ)-এর মধ্যে এ ধরনের রূহ্ ফুঁকে দেয়ার কথাই বলা হয়েছে এবং হযরত 'ঈসা ('আঃ)কে এ অর্থেই রূহুল্লাহ্ বলা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরের সময় অসাবধানতাবশতঃ "রূহ্" থেকে 'ব্যক্তিসত্তা' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ থেকেই হযরত আদম ('আঃ) ও হযরত ঈসা ('আঃ)-এর মধ্যে আল্লাহর প্রবেশের এবং সকল মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ আছেন - এমন উদ্ভট ধারণা সমূহ গড়ে উঠেছে।

প্রকৃত পক্ষে রূহ্ ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি হচ্ছে আগুনের স্পর্শে কোনো দাহ্য পদার্থে আগুন ধরানোর মতো যার ফলে মূল আগুন স্বস্থানেই থেকে যায়, সংশ্লিষ্ট দাহ্য পদার্থে প্রবেশ করে না। অথবা এ যুগের পরিভাষায় এর অধিকতর উত্তম তুলনা হতে পারে কোনো কম্পিউটারের অনেকগুলো ফাইলের মধ্য থেকে অন্য কোনো কম্পিউটারে কোনো একটি ফাইল কপি করার সাথে - যার ফলে মূল কম্পিউটার থেকে ফাইলটি বিলুপ্ত হয়ে যায় না।

অতীতে বিভিন্ন অংশীবাদী ধর্মে যে পূর্ববর্তী ধর্মনেতার মৃত্যুতে তার আত্মা পরবর্তী ধর্মনেতার মধ্যে প্রবেশের ধারণা গড়ে ওঠে (যেমন : বৌদ্ধ ধর্মের 'লামা') - আরবী ভাষায় যাকে حلول روح (কারো শরীরে অন্য কারো রূহের প্রবেশ) বলা হয়, শুরুতে হয়তো তা থেকে পূর্ববর্তী ব্যক্তির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট চেতনা অর্থ বুঝানো হতো, কিন্তু পরে এ থেকে ব্যক্তিসত্তা অর্থ গ্রহণ করা হয়।

কোরআন মজীদে জীবন (হায়াত্)-এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। প্রশ্ন হচ্ছে, দেহ ও আত্মা (নাফ্স্)-এর সংযুক্ত অবস্থার প্রতিক্রিয়াই কি জীবন, নাকি এ ছাড়াও জীবন বা প্রাণের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব রয়েছে? নাকি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা থেকে গড়ে ওঠা দেহের সক্রিয়তারূপ আপেক্ষিক অস্তিত্বই প্রাণ এবং তা-ই জীবনের কারণ?

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে সরাসরি কিছু বলা হয় নি, তবে কোরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াত থেকে এই শেষোক্ত তাৎপর্যই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, কোরআন মজীদে "হায়াত্" (জীবন) ছাড়াও "নাফ্স্" (ব্যক্তিসত্তা)-এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শরীর থেকে ব্যক্তিসত্তা (নাফ্স্) স্থায়ীভাবে বেরিয়ে যাবার কারণে মত্যু ঘটার কথা বলা হয় নি, বরং "মৃত্যুঘটা তথা শরীরযন্ত্র অকেজো হয়ে যাবার কারণে" শরীর থেকে ব্যক্তিসত্তা (নাফ্স্) স্থায়ীভাবে বেরিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার

সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা থেকে গড়ে ওঠা দেহের সক্রিয়তারূপ আপেক্ষিক অস্তিত্বই প্রাণ এবং তা-ই জীবনের কারণ।

কোরআন মজীদে রূহ্ ও হায়াত্ ছাড়াও নাফ্স্-এর কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে - যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাফ্স্ এতদুভয় থেকে স্বতন্ত্র এবং এটাই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিসত্তা। এরশাদ হয়েছে :

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

"আল্লাহ্ নাফ্স্ সমূহকে ফওত্ করিয়ে দেন (অধিগ্রহণ করেন) তার মৃত্যুর সময় এবং যে মারা যায় নি তার ঘুমের মধ্যে, অতঃপর, যার ওপরে মৃত্যুর ফয়ছ্বালা কার্যকর হয়েছে তাকে রেখে দেন এবং অপরটিকে তার আজালে মুসাম্মা (মৃত্যুর সময়) না আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য পাঠিয়ে দেন।" (সূরাহ্ আয্-যুমার্ : ৪২)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, ঘুমন্ত ও মৃত ব্যক্তি উভয়ের নাফসকেই আল্লাহ্ তা'আলা এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাধীনে অর্থাৎ 'আালামে বারযাখে নিয়ে নেন, তবে ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে পুনরায় ফিরিয়ে দেন, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নাফসকে আর ফিরিয়ে দেন না। বলা বাহুল্য যে, নাফসকে অধিগ্রহণ করা সত্ত্বেও ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীরের স্বয়ংক্রিয় কাজগুলো চলতে থাকে এবং সে জাগ্রত না থাকলেও জীবিত। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, শরীর জীবিত থাকার কারণ (عامل - factor) নাফ্স্ নয়, বরং অন্য কিছু। তা হচ্ছে শরীরের যান্ত্রিক

ক্রিয়া (ন্যূনতম ক্রিয়াগুলো হলেও) চালু থাকা, আর এ থেকেই প্রাণের আপেক্ষিক ধারণা নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং প্রাণ ও নাফ্স্ স্বতন্ত্র।

‘আ্যারেফগণ (ইসলামী আধ্যাত্মসাধকগণ) অবশ্য একই ব্যক্তিসত্তায় একাধিক নাফ্স্-এর প্রবক্তা। তাঁরা নাফ্স্-এর ক্ষেত্রে নাফসে আম্মারাহ্ (কুপ্রবৃত্তি বা কুপ্রবণ নাফ্স্), নাফসে লাওয়ামাহ্ (অনুগত নাফ্স্) ও নাফসে মুতমায়িন্নাহ্ (প্রশান্ত নাফ্স্) - এই তিন ধরনের নাফ্স্-এর কথা বলেন।

অবশ্য কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় নাফসে আম্মারাহ্ ও নাফসে মুতমায়িন্নাহর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা থেকে একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক নাফ্স্ রয়েছে এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কারণ, এ সব ক্ষেত্রে “আম্মারাহ্” , “লাওয়ামাহ্” ও “মুতমায়িন্নাহ্” হচ্ছে “নাফ্স্” -এর বিশেষণ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির পক্ষে ভালো বা মন্দ হওয়া সম্ভব, তেমনি অনুগত, বিদ্রোহী, অস্থিরচিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হওয়া সম্ভবপর। এ থেকে একটি দেহে একাধিক ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি প্রমাণিত হয় না। কারণ, নাফসকে বিভিন্ন ধরনের বিশেষণে বিশেষায়িত করা হলে তা থেকে নাফসের সংখ্যার একাধিক্য বুঝায় না। বস্তুতঃ কোনো নাফসের মধ্যে যেমন ভালো বা মন্দ কোনো একটি গুণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তেমনি তাতে বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণও হতে পারে। তেমনি বিভিন্ন গুণের পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সুতরাং একটি দেহে যে একটিমাত্র নাফ্স্ বা ব্যক্তিসত্তা থাকে এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

প্রতিটি বস্তুকণাতেই চেতনা

এ প্রসঙ্গে চমক সৃষ্টিকারী একটি তথ্য হচ্ছে এই যে, সাম্প্রতিক কালে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রতিটি বস্তুকণাতেই চেতনা বিদ্যমান। এ কথা মেনে নিলে বলা যায় যে, অনেকগুলো বস্তুকণার সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের ফলে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর একেকটি সুনির্দিষ্ট আকার-আকৃতি বিশিষ্ট একক গড়ে ওঠে অথচ মুল কণাগুলো কণাই থেকে যাচ্ছে ঠিক সেভাবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বস্তু-এককটি একটি উচ্চতর চেতনার অধিকারী হয় অথচ বস্তুকণাগুলোর মূল চেতনা যথাস্থানেই থেকে যাচ্ছে। একে বিভিন্ন সজীব কোষ এবং অণুজীব (যেমন : শ্বেতকণিকা) সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আমাদের বস্তুদেহের সাথে তুলনা করা যায় - যাতে উচ্চতর স্বতন্ত্র প্রাণসত্তা গড়ে উঠেছে যদিও অণুজীবগুলোর প্রাণশীলতা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

যদিও মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে, শরীর গঠনের এক পর্যায়ে বাইরে থেকে তাতে নাফ্‌স্‌ প্রবেশ করানো হয়, কিন্তু অনেক মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানী মনে করতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শরীর গঠনের এক পর্যায়ে তাতে নাফসের উদ্ভব হওয়ার ব্যবস্থা নিহিত রেখেছেন।

প্রতিটি অণুতে চেতনা থাকার ধারণা সঠিক হবার সম্ভাবনার সপক্ষে কোরআন মজীদ থেকে সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, আমরা যে সব অস্তিত্বকে স্রেফ্‌

বস্তুগত সত্তা বা জড়বস্তু বলে থাকি কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে সেগুলোরও প্রাণ ও ব্যক্তিসত্তা আছে। কোরআন মজীদে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অস্তিত্ব কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলাকে সিজদাহ্ করার ও তাঁর তাসবীহ্ করার কথা বলা হয়েছে, যদিও সে সিজদাহ্ ও তাসবীহর ধরন আমাদের সিজদাহ্ ও তাসবীহ্ করার অনুরূপ নয়, তবে বিভিন্ন আয়াতের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সিজদাহ্ ও তাসবীহর কথা রূপক অর্থে বলা হয় নি, বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)

"সাত আসমান ও পৃথিবী এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ্ (মহিমা বর্ণনা) করে এবং এমন কোনো কিছু নেই যা (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তাঁর তাসবীহ্ না করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ অনুধাবন করতে পারো না।" (সূরাহ্ আল্-ইসরা' / বানী ইসরাঈল্ : ৪৪)

এখানে তাসবীহ্ করার কথাটা যদি রূপকার্থক হতো, অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার তৈরী প্রাকৃতিক বিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ - এটা বুঝানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এ কথা বলার প্রয়োজন হতো না যে, আমরা তাদের তাসবীহ্ অনুধাবন করতে পারি না। বরং এ কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সব কিছু স্বেচ্ছায় তাসবীহ্ করে।

অবশ্য কেউ হয়তো এ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, কাফের-নাস্তিকরা তো আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, তাই তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ করার কথা আসে কীভাবে? এর জবাব হচ্ছে এই যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির দাসত্বের কারণে আল্লাহকে স্বীকার করে না বটে, কিন্তু তারা তাদের সহজাত জ্ঞানের দ্বারা জানে যে, একজন মহাজ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত এ জগত অস্তিত্বলাভ করে নি। অন্যদিকে তারা যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোনো সৃষ্টির সৃষ্টিকুশলতা ও গুণাবলীর প্রশংসা করে তখন কার্যতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা করে, ঠিক যেভাবে কোনো শিল্পকর্মের প্রশংসা করা মানেই তার শিল্পীর প্রশংসা।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ)

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) আসমানের প্রতি মনোযোগ দিলেন, আর তখন তা ছিলো ধূম্র (গ্যাসীয় আকারে); তখন তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন : উভয়ই (নিয়ন্ত্রণে) এসো স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাক্রমে। তখন উভয় বললো : আমরা স্বেচ্ছায় (নিয়ন্ত্রণে) এলাম।" (সূরাহ্ ফুছ্বছ্বিলাত্/ হা-মীম্-আস্-সাজদাহ্ : ১১)

এখানে 'উভয় স্বেচ্ছায় (নিয়ন্ত্রণে) এলো' না বলে 'উভয় বললো : ....' বলা থেকে সুস্পষ্ট যে, বিষয়টি রূপক বা ভাবার্থক নয়, বরং আসমান ও যমীনের

প্রাণ ও ব্যক্তিসত্তা আছে। সুতরাং যা কিছু তাসবীহ্ করে সেগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রাণ ও ব্যক্তিসত্তা আছে - তা যে স্তরেরই হোক না কেন।

ইসলাম চৌদ্দশ' বছর আগে উদ্ভিদ কর্তৃক আল্লাহকে সিজদাহ্ করার কথা বলেছে এবং তাদের প্রাণ, চেতনা, সুখ-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনা থাকার কথা বলেছে তথা তাদের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছে - কেবল বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানীরা যার সন্ধান পেয়েছেন। বর্তমান যুগের অনেক বিজ্ঞানী ভিন্ন মাত্রার (Dimension) প্রাণের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাঁরা পৃথিবী, আগুন, বাতাস ইত্যাদিতেও প্রাণের ও ব্যক্তিসত্তার সন্ধান পাবেন। সব কিছুতে প্রাণ থাকার বিষয়টি কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়। এরশাদ হয়েছে :

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

"আর এ দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ নয় এবং নিঃসন্দেহে আখেরাতের গৃহ প্রাণময়; যদি তারা জানতো!" (সূরাহ্ আল্-'আনকাবূত্ : ৬৪)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, সব কিছুতেই প্রাণ আছে, কিন্তু আমরা আমাদের শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে সকল কিছুর প্রাণ সম্পর্কে বুঝতে পারি না। আখেরাতের জীবনে এ সীমাবদ্ধতা থাকবে না বলেই সেখানে সকল প্রাণ সম্পর্কে বুঝতে পারা সম্ভব হবে।

যা-ই হোক, প্রতিটি বস্তুকণায় চেতনা আছে, এর মানে হচ্ছে প্রতিটি বস্তুকণাকে জুড়ে একটি অবস্তুগত অস্তিত্বও রয়েছে। তেমনি সুনির্দিষ্ট

প্রাকৃতিক বিধিবিধানের আওতায় যখন বস্তুকণাসমূহ মিলে একটি উচ্চতর বস্তু-একক গড়ে ওঠে, সাথে সাথে তার মধ্যে একটি উচ্চতর চেতনা ও ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে - যা বস্তু থেকে গড়ে উঠলেও এবং বস্তুকে আশ্রয় করে অবস্থান করলেও তা ভিন্ন মাত্রার অবস্তুগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ফলে বস্তুসত্তা বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও সে অবস্তুগত সত্তা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, বরং তা এক ভিন্ন মাত্রার জগতে অবস্থান গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক।

এভাবে কার্যতঃ বস্তুগত এককসমূহ, বিশেষতঃ শরীর সমূহ যেমন বিভিন্ন বস্তুগত এককের সমন্বয়ে গঠিত অথচ সে এককগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও অব্যাহত থাকে, তেমনি তাকে আশ্রয় করে স্বতন্ত্র উচ্চতর নাফ্স্ গড়ে উঠলেও তার এককসমূহের নাফ্স্ স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বমান থাকে।

নাফসের এ ধরনের ধারণা কোরআন মজীদের আয়াত থেকেও পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে :

(حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ)

"আর তারা যখন তার (জাহান্নামের) কাছে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন তারা তাদের ত্বককে বলবে : কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তখন তারা (চামড়া সমূহ) বলবে : যে আল্লাহ্ সব কিছুকেই বাকশক্তি দিয়েছেন তিনিই

আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন।" (সূরাহ্ ফুছ্বছ্বিলাত্/ হা-মীম্-আস্-সাজদাহ্ : ২০-২১)

এ থেকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা এবং সেই সাথে ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র ও উচ্চতর ব্যক্তিসত্তা প্রমাণিত হয়। এটা অনেকটা একটা গাড়ীর ব্যাটারী, রেডিও, ইঞ্জিন, লাইট ইত্যাদির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও এতদসহ গাড়ীটির স্বতন্ত্র উচ্চতর অস্তিত্বের ন্যায়, যদিও প্রাণীদেহের সাথে এর তুলনা এক ধরনের দুর্বল উপমা মাত্র।

মোদ্দা কথা, শরীর যেমন বিভিন্ন একক সমন্বয়ে গঠিত এককসমূহের স্বাতন্ত্র্য সহকারেই একটি উচ্চতর যৌগিক সত্তা তেমনি একটি প্রাণীর ব্যক্তিসত্তা (নাফ্স্)ও কতক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য সহকারেই একটি উচ্চতর ব্যক্তিসত্তা (নাফ্স্)। আর আখেরাতে যেভাবে সকল কিছুতে প্রাণের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে এবং নাফসের এ ধরনের যৌগিকতার ওপর থেকে অজ্ঞানতার পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে, 'আলামে বারযাখ্ 'আখেরাতের জীবনের অবস্তুগত নমুনা বিধায় সেখানেও এ পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে বলে যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয় ও তার কর্মক্ষমতা

আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি যে, ঐশী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে ও অনুমতিক্রমে ‘আলামে বারযাখে অবস্থিত নাফ্স্ বস্তুজগতের অধিবাসীদেরকে দেখতে পায় ও তাদের কথা শুনতে পায়। এর সপক্ষে আমরা প্রমাণও উপস্থাপন করেছি। এ থেকে বস্তুদেহের সাহায্য ছাড়াও যে নাফ্স্ শুনতে ও দেখতে পারে এটাই প্রমাণিত হয়।

এর মানে হচ্ছে, শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয় ছাড়াও নাফসের স্বতন্ত্র ও অবস্তুগত ইন্দ্রিয়নিচয় রয়েছে। আর ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তির জীবিত অবস্থায়ই, এমনকি কেবল স্বপ্নে নয়, জাগ্রত অবস্থায়ও, নাফ্স্ তার এ সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুজাগতিক তথ্য অবগত হতে পারে। এ ব্যাপারে অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ জাগ্রত অবস্থায় সহসাই তার দৃষ্টির অন্তরালবর্তী কোনো ঘটনা হুবহু সম্মুখে সংঘটিত ঘটনার ন্যায় সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারে এবং পরে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে স্বপ্নে দেখা ঘটনা - যা স্বপ্নে দেখার আগে ঘটে নি - ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর পরই বা অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে দেখার দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে স্বপ্নে প্রতীকী আকারে ভবিষ্যত ঘটনা দেখতে পায় এবং অনেকে হুবহু দেখতে পায়।

এছাড়া ঘুমের সময় মানুষের শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয় নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বপ্নে পঞ্চেন্দ্রিয়ের হুবহু অভিজ্ঞতা লাভ করে, এমনকি তা তার শরীরের ওপরও প্রতিক্রিয়া করে। এটাও নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয়ের প্রমাণ বহন করে। বস্তুবাদীরা - যারা আল্লাহ্ তা'আলার ও বস্তু-উর্ধ নাফসের অস্তিত্ব স্বীকার করে না - স্বপ্নকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলে দাবী করে থাকে। তাদের মতে, ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় যা কল্পনা করে স্বপ্নে তা-ই দেখে থাকে। এটা যে, পুরোপুরি ভিত্তিহীন সে ব্যাপারে যে কারোই অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। কারণ, মানুষ অনেক সময়ই এমন স্বপ্ন দেখে যা সে কোনোদিনই কল্পনা করে নি। তার চেয়েও বড় কথা, বস্তু-উর্ধ নাফ্স্ না থাকলে বস্তুগত মস্তিষ্কের পক্ষে কোনো কিছু কল্পনা করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, বস্তুধর্ম অনুযায়ী মস্তিষ্কে কেবল তা-ই ধরা পড়বে যা বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে; যা আদৌ ঘটে নি তা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হতে বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল বস্তু-উর্ধ সৃজনশীল নাফ্স্ই কল্পনা করতে পারে এবং সে এ ধরনের কল্পসৃষ্টি আঞ্জাম দিলে কেবল তখনি তা মস্তিষ্কের তথ্যভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে পারে।

আবার অনেক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর মতে, মানুষের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতীকী রূপ ধরে স্বপ্নে দেখা দেয়। এ দাবী অধিকতর ভিত্তিহীন। কারণ, অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যদি আমরা এক ধরনের কল্পচিত্র বলে ধরে নেই (যদিও ওপরে উল্লেখ করেছি যে, তা নাফসের কাজ, মস্তিষ্কের কাজ নয়) তো স্বপ্নে

সে কল্পচিত্র হুবহু ধরা পড়তে পারে; তা প্রতীকী রূপ ধারণ করার কোনো কারণ নেই।

অবশ্য যারা স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেন তাঁদের লেখার কিছু অংশ কোনো কোনো ধর্মীয় সূত্র থেকে নেয়া এবং বেশীর ভাগই বহু লোকের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে গৃহীত উপসংহার; এ সব তাৎপর্যের সব কিছু সঠিক প্রমাণিত না হলেও কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সব সময়ই সঠিক হতে দেখা যায়। যেমন : স্বপ্নে কুকুর দেখলে তা শত্রুর প্রতীক এবং কুকুরে কামড়াতে দেখলে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রতীক, অন্যদিকে সাপ হচ্ছে কুটিল ও হিংসুক শ্রত্রুর প্রতীক এবং সাপে কামড়াতে দেখলে এ ধরনের শত্রুর পক্ষ থেকে হিংস্র শত্রুতা চরিতার্থকরণের প্রতীক, আগুন শান্তির প্রতীক, কিন্তু আগুন ঘরে লাগতে দেখলে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তির প্রতীক, স্বচ্ছ পানি শান্তির প্রতীক, ঘোলা পানি দুর্যোগ ও সমস্যায় পড়ার প্রতীক, ধোঁয়া দুর্যোগ ও বিপদের প্রতীক, ইত্যাদি। এগুলোর সবই ভবিষ্যত সংক্রান্ত; বস্তুগত মস্তিষ্ক এগুলো জানবে কী করে এবং তার চেয়েও বড় কথা, এগুলোকে প্রতীকী রূপ দেবে কীভাবে? প্রতীকী রূপ প্রদান তো বস্তুধর্মের আওতা বহির্ভূত।

অবশ্য স্বপ্নে নাফ্স্ এগুলোকে প্রতীকী রূপে দেখলেও স্বয়ং নাফ্স্ এগুলোকে প্রতীকী রূপ প্রদান করেছে এটা মনে করা ঠিক হবে না। বরং স্বপ্নলোক যেহেতু 'আলামে বারযাখেরই একটি অংশ সেহেতু সে জগতে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর অধীনেই এগুলো প্রতীকী রূপে প্রতিভাত হয় এবং নাফ্স্ সেগুলোকে এভাবেই দেখে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের ভিতরের ব্যক্তিসত্তা (নাফ্‌স্)-এর স্বরূপে উত্থিত হবে; বিভিন্ন ইসলামী সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী খারাপ লোকেরা সেখানে কুকুর, শুকর, গাধা, সাপ ইত্যাদির চেহারা নিয়ে উত্থিত হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে চেনা যাবে যে, তারা অমুক অমুক ব্যক্তি। কোরআন মজীদে এ সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে; এরশাদ হয়েছে :

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى)

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণকে (বা কোরআনকে) পাশ কাটিয়ে যায় অবশ্যই তার জীবন হবে দুর্বিষহ এবং ক্বিয়ামতের দিনে আমি তাকে অন্ধরূপে সমাবেশস্থলে উত্থিত করবো। তখন সে বলবে : হে আমার রব! আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলোম, তাহলে কেন আমাকে অন্ধরূপে উত্থিত করেছো? তখন তিনি (আল্লাহ্) বলবেন : এটাই (যথোপযুক্ত), কারণ, তোমার নিকট আমার আয়াত সমূহ এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা (ইচ্ছাকৃতভাবে) বিস্মৃত হয়েছিলে (উপেক্ষা করেছিলে), তাই এভাবেই আজকের দিনে তুমি বিস্মৃতিকবলিত হয়েছো (অনুগ্রহ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছো)।" (সূরাহ্ ত্বা-হা : ১২৪-১২৬)

প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনে থাকাকালেই যে ব্যক্তি তার নাফসের দৃষ্টিশক্তিকে সত্যদর্শনের ক্ষেত্রে অন্ধ করে ফেলেছিলো ক্বিয়ামতের দিনে তাকে সেরূপেই উত্থিত করা হবে। কারণ, সেখানে তার পার্থিব জীবনের বস্তুনিচয় দর্শনের

ক্ষমতার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। এদের অবস্থা রঙ-কানা চর্মচক্ষুর অধিকারী ব্যক্তির ন্যায় - যে বিশেষ কোনো রঙ ও সে রঙের বস্তুনিচয় দেখতে পায় না। এভাবে যারা স্বীয় নাফসের সত্যদর্শনক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলেছে তাদের সম্পর্কেই অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا)

"আর যে ব্যক্তি এখানে (এ দুনিয়ার বুকে) অন্ধ (সত্যদর্শনের ক্ষেত্রে যার নাফসের দর্শনক্ষমতা বিলুপ্ত) অতঃপর আখেরাতেও সে হবে অন্ধ; বস্তুতঃ পথের বিচারে সে চরমভাবে ভ্রষ্ট।" (সূরাহ্ আল্-ইসরা' / বানী ইসরাঈল্ : ৭২)

এ অন্ধত্ব যে চর্মচক্ষুর অন্ধত্ব নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়ার বুকে যদি কারো চর্মচক্ষু অন্ধ হয় তো তা তার অপরাধ নয়, বরং এ ধরনের ব্যক্তি ঈমানদার ও নেককার হলে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে এবং সেখানে সে চক্ষুষ্মান হবে - এটাই আল্লাহ্ তা'আলার ইনছ্বাফের দাবী।

অন্যত্র নাফসের চক্ষু-কর্ণের বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; এরশাদ হয়েছে :

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ)

"(হে রাসূল!) তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আপনার কথা শোনে; কিন্তু আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন যখন তারা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগায় না? আর তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আপনার প্রতি

দৃষ্টিপাত করে; কিন্তু আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন যখন তারা (অন্তর্চক্ষুর দ্বারা) দেখে না?" (সূরাহ্ ইউনুস্ : ৪২-৪৩)

এ থেকেই সুস্পষ্ট যে, হাশরের মাঠে অনেক লোকের কুকুর, শুকর, গাধা ইত্যাদি রূপে উত্থিত হওয়ার ধারণা পুরোপুরি সঠিক। কারণ, সেখানে সকলেই নিজ নিজ নাফসের স্বরূপে উত্থিত হবে। আর যেহেতু 'আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আখেরাতের জীবনের একটি নমুনা মাত্র সেহেতু এতে সন্দেহ নেই যে, সেখানেও নাফ্স্ সমূহ স্বরূপে অবস্থান করছে যদিও তা সত্ত্বেও সে জগতের অবস্থা যারা দেখতে পান তাঁদের পক্ষে পার্থিব জীবনে যে জন যে ব্যক্তি ছিলো তা চিনতে কোনো রকম অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। অন্যদিকে স্বপ্নলোক যেহেতু 'আালামে বারযাখেরই একটি অংশ সেহেতু সেখানে পার্থিব জগতের মানুষদের নাফসের কর্মতৎপরতা তাদের ভিতরের রূপ সহকারে ধরা পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই সেখানে শত্রু কুকুর বা সাপরূপে এবং তার আক্রমণপরিকল্পনা কামড়রূপে ধরা পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো, 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদের (নাফসের) অবস্তুগত ইন্দ্রিয়নিচয়ের কার্যক্ষমতা কতোখানি, বিশেষ করে এগুলোর দ্বারা তাদের পক্ষে বস্তুজগতের তথ্যাদি লাভ করা কতোখানি সম্ভব?

এ ব্যাপারে আমরা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, 'আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন বিশেষ ব্যবস্থাধীন একটি জগত। সুতরাং, পার্থিব জগতের অধিবাসীদের পক্ষে পার্থিব জগতে বস্তুগত বাধামুক্ত পরিবেশে স্বীয়

শারীরিক ইন্দ্রিয়নিচয়কে যেরূপ স্বাধীনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব 'আলামে বারযাখের অধিবাসীদের পক্ষে স্বীয় নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয়কে পার্থিব জগতের তথ্যাদি লাভের ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, ঐ জগতের অবস্থা সম্বন্ধেও অনুরূপ স্বাধীনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবার প্রশ্নই ওঠে না। বরং কেউ কেবল ততোখানিই স্বীয় (নাফসের) ইন্দিয়নিচয়কে ব্যবহার করতে পারে যতোখানি কাজে লাগানোর জন্য ঐ বিশেষ ব্যবস্থাধীনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে বা হবে। এ সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আমাদেরকে 'আলামে বারযাখে নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয়ের কার্যক্ষমতার আওতা ও মাত্রা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

'আলামে বারযাখে অবস্থানরত নাফ্‌স্ সমূহের যে সব ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক একান্তভাবে কেবল পুরষ্কার ও শাস্তি ভোগ করার সাথে (অর্থাৎ নাসিকা, জিহবা ও ত্বক্) সেগুলোর সাথে আমাদের পার্থিব জগতের কোনোই সম্পর্ক থাকার কথা নয়। আমাদের জগতের সাথে সম্পর্ক আছে কেবল তাদের শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা এবং কথা বলার ক্ষমতার সাথে (শর্তাধীনে- যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাই এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যেহেতু 'আলামে বারযাখ্ একটি ভিন্ন মাত্রার জগত সেহেতু সেখানে অবস্থানরত স্বয়ং নাফসের ক্ষেত্রে এবং তার শ্রবণ, দর্শন ও বাচন ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমাদের পার্থিব জগতের বাধাসমূহ, বিশেষ করে স্থানগত দূরত্ব সেখানে কার্যকর হবার কথা নয়। তাই অনুমতিপ্রাপ্ত নাফ্‌স্ সমূহের পক্ষে

বিশ্বের যে কোনো জায়গাকে বা ব্যক্তিকে দেখা, যে কোনো কথা ও শব্দ শোনা এবং যে কোনো কথা বলার জন্য অনুমতি থাকলেই তার পক্ষে তা দেখা ও শোনা এবং কথা বলা সম্ভবপর। আর যেহেতু তারা ভিন্ন মাত্রার জগতের অধিবাসী এবং নাফসের ইন্দ্রয়নিচয় মাত্রাগত দিক থেকেও বস্তুদেহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত সেহেতু এ ক্ষেত্রে অনুমতিলাভ সাপেক্ষে কোনো নাফসের পক্ষে একই সময় অনেকের কথা শোনা ও অনেককে দেখা এবং অনেকের কাছাকাছি হওয়া ও অনেকের কাছে স্বীয় মনোভাব পৌঁছানো সম্ভবপর।

হাশরের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলবেন :

(لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)

"এ (দিন) সম্পর্কে তো তুমি উদাসীন ছিলে। তাই আজ আমি তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, সুতরাং তোমার দর্শনক্ষমতা আজ সীমাবদ্ধতামুক্ত।" (সূরাহ্ ক্বাফ্ : ২২)

এর মানে এ নয় যে, কেবল কাফের ব্যক্তিদের দর্শনক্ষমতা সীমাবদ্ধতামুক্ত হবে, বরং সেটি হচ্ছে এমন জগত যেখানে কারো দর্শনক্ষমতাই সীমাবদ্ধতার অধিকারী হবে না। আর সীমাবদ্ধতামুক্ত হবার মানে এ নয় যে, ব্যক্তি কেবল নিজের অতীত জীবনের সব কিছু দেখতে পাবে, বরং আক্ষরিক অর্থেই অতীত ও বর্তমান (অর্থাৎ তখনকার বর্তমান) এবং ভিতর-বাহিরের সব কিছু দেখতে পাবে। সুতরাং এ থেকে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া চলে যে, তখন মানুষ বস্তুদেহের অধিকারী হবে বটে তবে তা হবে এমন বস্তুদেহ যার

ইন্দ্রিয়নিচয় পার্থিব জীবনের ইন্দ্রিয়নিচয়ের সীমাবদ্ধতার ন্যায় সীমাবদ্ধতার অধিকারী হবে না, বরং সে বস্তুদেহে নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয় হুবহু কার্যকর থাকবে।

আর যেহেতু 'আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আখেরাতের জগতের অবস্তুগত প্রতিচ্ছবি সেহেতু শর্তাধীনে সেখানেও নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং অনুমোদিত ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পার্থিব জগতের সাথে অনুমোদিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি পুরাপুরি কার্যকর। আর ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, 'আলামে বারযাখে নাফ্স্ সমূহ স্বরূপে অবস্থান করছে এবং হাশরের মাঠে স্বরূপে (বস্তুদেহ ধারণ করে) উত্থিত হবে এবং সকলে সকলকে স্বরূপে দেখতে পাবে সেহেতু সীমাবদ্ধতাহীন দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতার দাবী হচ্ছে এই যে, 'আলামে বারযাখের অধিবাসীরা বস্তুজগতের অধিবাসীদেরকে দেখতে পেলে ও তাদের কথা শুনতে পেলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাফসের স্বরূপ সহকারে দেখতে পায় এবং তাদের কথার পিছনে নিহিত তাদের অন্তরের অবস্থা সহকারে শুনতে পায়। অর্থাৎ তারা বস্তুলোকবাসী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে শুধু বাহ্যিক তথ্যাদি লাভ করে না, বরং তার পিছনে নিহিত প্রকৃত সত্যও জ্ঞাত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে তো মৃত ব্যক্তির নাফ্স্ কেবল তার বিলাপ শুনতে পায় না এবং কেবল তাকে বিলাপরত দেখতে পায় না, বরং তার বিলাপ আন্তরিক, নাকি কপট তা-ও দেখতে ও শুনতে পায়। ধরা যাক, কেউ কপটভাবে বিলাপ করছে, কিন্তু আসলে সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুতে খুশী হয়েছে,

এ ক্ষেত্রে হয়তো মৃত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ তাকে আনন্দে অট্টহাস্য করতে দেখে এবং তার কপট বেদনার্ত ক্রন্দসী চেহারাকে অট্টহাসিরত ক্রুর হায়েনার চেহারা রূপে দেখতে পারে। কারণ, ‘আলামে বারযাখে বস্তুলোকবাসীদের আন্তরিকতা ও কপটতা এবং অন্য সমস্ত রকমের মানসিক অবস্থা অবস্তুগত মূর্ত রূপ ধারণ করে।

স্বপ্ন : বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে

বস্তুবিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাফ্‌স্‌ সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের নির্ভুল জবাবদানে সক্ষম নয়, তবে এ ব্যাপারে বিচারবুদ্ধিকে সহায়তা দিতে সক্ষম। তাই এতদসংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য বিবেচনাযোগ্য।

অবশ্য প্রকৃত ও অকাট্য বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে কাল্পনিক ব্যাখ্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বপ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে অনেকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে একে মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎপরতা ও স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল বলে দাবী করেছেন। কিন্তু এ দাবীর পিছনে কোনো যুক্তি নেই এবং অভিজ্ঞতাও তা সমর্থন করে না।

প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়ে না, বরং মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়ে - যে কারণে কর্মক্ষম ও কাজ করতে অভ্যস্ত ব্যক্তি কাজ না করলেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ, তার শরীর ক্লান্ত না হলেও জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের কর্মতৎপরতার কারণে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে বিধায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ঘুমের মধ্যে তার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠা বা উত্তেজিত হওয়ার পিছনে কোনো শারীরিক তথা বস্তুগত কারণ ধরে নেয়াটা স্রেফ্‌ কল্পনামাত্র; কেবল কোনো অবস্তুগত কারণ তাকে সক্রিয় করে তোলে। তা হচ্ছে,

সৃষ্টিজগতের ঐশী ব্যবস্থাধীনে তার অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা (নাফ্‌স্‌)কে এক অবস্তুজগতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নাফ্‌স্‌ তার সেখানকার অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রাখার জন্যই স্বীয় ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে তোলে।

যারা বলেন যে, স্বপ্ন পূর্ব-অভিজ্ঞতার স্মৃতির প্রত্যাবর্তন বা স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল বা অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রভাব তাঁদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মানুষ এমন অনেক স্বপ্নও দেখে যা তার অভিজ্ঞতাবহির্ভূত। যেমন : কেউ যখন স্বপ্নে নিজেকে উড়তে দেখে তখন তা তার পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রত্যাবর্তন নয়। তেমনি তা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রভাবও নয়। কারণ, মানুষ আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষা করলে নিজের পিঠে দু'টো পাখা কল্পনা করে, কিন্তু যারা স্বপ্নে নিজেকে উড়তে দেখে তারা পাখা ছাড়াই উড়তে দেখে। এ ক্ষেত্রে বরং অনেকের অভিজ্ঞতা থেকেই স্বপ্নব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যার যথার্থতা পাওয়া যায় - যারা বলেন যে, স্বপ্নে উড়তে দেখলে সে ব্যক্তি কোনো দূরবর্তী জায়গায়, বিশেষতঃ বিদেশে সফর করবে এবং প্রায়শঃই দেখা যায় যে, ঐ রকম দূরবর্তী জায়গায় সফরের কথা সে পূর্বে কখনো কল্পনা করে নি।

অন্যদিকে স্নায়বিক উত্তেজনা সুশৃঙ্খল পূর্বস্মৃতিকে এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করতে পারে, সুবিন্যস্তভাবে নয়; পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন একটি সুশৃঙ্খল মধুর স্বপ্ন তৈরী করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

শুধু তা-ই নয়, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখছে তাকে সহসাই কেউ ডাক দিয়ে বা ধাক্কা দিয়ে জাগ্রত করার চেষ্টা করলে সে নিজেকে সংশ্লিষ্ট স্বপ্নদৃশ্যের ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত ছুটে আসতে এবং নিজেকে নিজের শরীরে প্রবেশ করতে দেখে। বিশেষ করে নিজেকে নিজের শরীরে প্রবেশ করতে দেখার কাজটি প্রায়জাগ্রত অবস্থায় ঘটে থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনকারীর অবস্তুগত শরীর (নাফ্‌স্‌) তার বস্তুদেহে প্রবেশ করার পর পরই বস্তুদেহ মোটামুটি চেতনা ফিরে পায়।

জাগ্রত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ কি শরীর থেকে বের হতে পারে?

অনেকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলে জাগ্রত অবস্থায়ই স্বীয় দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন (অর্থাৎ তাঁর নাফ্‌স্‌ বা আত্মা তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে) এবং দূরবর্তী কোথাও পরিভ্রমণ শেষে পুনরায় ফিরে এসে দেহে প্রবেশ করেছেন - এ মর্মে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির দেহ থেকে তার অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা বেরিয়ে যাবার পর দেহ ঘুমন্ত অবস্থা বা প্রায় মৃত অবস্থা লাভ করে, এমনকি তার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তচলাচলও এতোই কমে যায় যে, দৃশ্যতঃ মনে হয় যে, তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তাতে প্রাণের চিহ্ন প্রায় স্থগিত হয়ে যায়। বলা হয় যে, দেহ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সাহসের কারণেই তা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার দেহের ক্ষতি হবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করার কারণেই এভাবে দেহ

থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরূপ অবস্থায় সে দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে সেখানকার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে এবং ফিরে এসে দেহে প্রবেশের পর তার হুবহু বর্ণনা দিয়েছে, আর যাচাই করার ফলে তা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ ধরনের বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের অনেক ঘটনার বর্ণনা সাম্প্রতিক কালের (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের) - যখন যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির কারণে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বর্ণনা চালিয়ে দেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিলো। তাছাড়া বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ ও আরো কতক ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের কাজ অসম্ভব বলে মনে হয় না।

বস্তুতঃ মানুষ যখন জাগ্রত থাকে এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকে তখন তার মনোযোগের বেশীর ভাগই তার শরীরের প্রতি নিবদ্ধ থাকে যাতে তার শরীর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তার কাজকর্মে ভুল না হয়। আর মনোযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নাফসের কাজ এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়নিচয় নাফসের মনোযোগের অনুবর্তিতা করে মাত্র। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকার সময় শরীরের ক্ষতি না হওয়ার বা শরীরের দ্বারা ভুল কাজ সম্পাদিত না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণেই নাফসের পক্ষে শরীরকে ঘুমাবার সুযোগ দেয়া সম্ভব হয়। তাই দেখা যায়, ভয়-ভীতির পরিস্থিতিতে বা কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে শরীর ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও মানুষ না ঘুমিয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করে এবং নিয়মিত অভ্যাসের তুলনায় অনেক

দেরীতে বা খুব কম সময়ের জন্য অথবা খুব হাল্কাভাবে ঘুমায়; এটা নাফসের সিদ্ধান্তের ফলেই হয়ে থাকে।

অবশ্য নাফসের পক্ষে শরীরের সহনক্ষমতার একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত তাকে জাগ্রত রাখা সম্ভব হয়। তবে শরীরের ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় তার পক্ষে ইন্দ্রিয়নিচয় থেকে পুরোপুরি সেবা লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় যে, সে সব কিছু ঠিকমতো দেখতে পায় না, সব শব্দ বা কথা ঠিকমতো শুনতে পায় না, সব স্পর্শ ঠিকমতো অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন স্বপ্ন দেখলে তা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায় এবং স্বপ্নে যে সব কথা শোনে তা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে শুনতে পায়। অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় নাফসের মনোযোগের সিংভাগ শরীরের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে হলেও ঘুমন্ত অবস্থায় তার আর দরকার না থাকায় স্বপ্নলোকে নাফসের অবস্তুগত ইন্দ্রিয়নিচয় অধিকতর ভালোভাবে কাজ করে। তবে ঘুমের সময় নাফ্‌স্‌ আর জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বাধীন থাকে না, বরং তাকে ঐশী ব্যবস্থাপনাধীন 'আলামে বারযাখের একটি অংশে নিয়ে যাওয়া হয় বিধায় তার পক্ষে বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আত্মিক সাধনাবলে কারো নাফ্‌স্‌ যদি খুবই সাহসী ও নির্ভয় হয়ে উঠতে পারে সে ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থায় তার পক্ষে সাময়িকভাবে শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া ও বস্তুজগতে বিচরণ করা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

জাদুবিদ্যা : নাফসের শক্তির নিদর্শন

নাফসের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধির একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে জাদুবিদ্যা। এখানে আমরা জাদুবিদ্যা বলতে আধুনিক কালের বস্তুবিজ্ঞান ও বিভিন্ন কলাকৌশলের আশ্রয় নিয়ে যে সব ম্যাজিক দেখানো হয় তার কথা বলছি না, বরং মানসিক শক্তির দ্বারা লোকদেরকে সম্মোহিত করে কাল্পনিক দৃশ্য ও ঘটনা দেখানো অথবা কোনো কাজ করতে বাধ্য করার কথা বলছি।

প্রকৃত জাদুকর বর্তমান যুগে হয়তো আদৌ নেই, তবে অতীতে ছিলো এবং জাদু ও জাদুকরের কথা কোরআন মজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা রোগীর চিকিৎসার জন্য রোগীকে সম্মোহিত করা ও জাদুকরের দ্বারা কৃত সম্মোহনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মনোরোগী স্বীয় সুস্থতার লক্ষ্যে মনোবিজ্ঞানীর নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্বেচ্ছায় সম্মোহিত হয়, কিন্তু জাদুকর কেবল স্বীয় মানসিক শক্তির বলে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে।

অতীতে ভারত উপমহাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে জাদুচর্চা ছিলো এবং জাদুশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে আসামের কামরূপ-কামাখ্যা বিখ্যাত ছিলো। জাদুশিক্ষার পর তার চূড়ান্ত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে যা শোনা যেতো তা হচ্ছে, জাদু শিক্ষাকারী ব্যক্তিকে অমাবস্যার রাতে জনবিচ্ছিন্ন শ্মশানে সারারাত রাত কাটাতে হতো; সে যদি নির্ভয়ে সেখানে একাকী রাত কাটাতে পারতো তাহলে প্রমাণিত হতো যে, সে জাদু আয়ত্ত করতে পেরেছে।

আসলে শ্মশানে ভয়ের কিছু আছে কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে যে, এ ধরনের জায়গায় একা যেতে এমনিতেই মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি হয়, তা সে ভয়ের পিছনে কোনো যৌক্তিক কারণ থাকুক বা না-ই থাকুক। এমতাবস্থায় অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে এহেন জায়গায় সারা রাত কাটানোর জন্য লৌহকঠিন মানসিক শক্তির প্রয়োজন। নাফসের এ শক্তিই অন্য মানুষের মনকে প্রভাবিত করে তাকে সম্মোহিত করতে পারে।

সাপুড়ে যেভাবে সাপ ধরে

সাপুড়ে কর্তৃক সাপ ধরার কাজটিও পুরোপুরি নাফসের মানসিক শক্তি তথা সাহসিকতার নিদর্শন।

সাপ ধরার সময় বা সাপকে নিয়ে খেলা দেখানোর সময় সাপুড়ে যে মন্ত্র আওড়ায় তা আসলে কতোগুলো অর্থহীন কথা মাত্র; স্বীয় মানসিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যেই সে এ কথাগুলো আওড়ায়। কিন্তু সাপুড়ে যেভাবে সাপ ধরে অন্য কেউ এ মন্ত্র আওড়ালেও তার মনে যদি সাপ থেকে ভয় থাকে তো সে সাপ ধরতে পারবে না, বরং সাপই তাকে দংশন করবে।

প্রকৃত পক্ষে সাপুড়ে যে কারণে সাপ ধরতে সক্ষম হয় তা তার দীর্ঘদিনের চর্চাজাত মানসিক শক্তির কারণে মাত্র। আসলে সাপুড়ে তার নাফসের শক্তি তথা সাহসের কারণে সাপকে এক হাতের মুঠোয় ধরার উপযোগী একটা নিরীহ মাছকে ধরার মতোই অবলীলাক্রমে ধরে ফেলে।

আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন ইতর প্রাণী এমন অনেক আলোকতরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গ দেখতে ও শুনতে পায় যা মানুষ দেখতে বা শুনতে পায় না। তেমনি এ-ও খুবই সম্ভব যে, ইতর প্রাণীরা মানুষের নাফসের স্বরূপ দেখতে পায়। এ কারণেই সাপ কোনো সাপুড়েকে দেখলে দিশাহারা হয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে পুলিশ যাকে খুঁজছে এমন কোনো ব্যক্তি পুলিশের সামনে পড়লে দিশাহারা হয়ে পড়ে এবং কী করবে বুঝতে পারে না; পালাবার চেষ্টা করার মতো সাহসও হারিয়ে ফেলে।

সাপুড়ের শিশুসন্তানরা যেভাবে সাপধরা শেখে তা হচ্ছে, প্রথমে তারা তাদের বাবা-মা' র সাথে থেকে সাপ ধরে। শিশু যখন সাপকে ধরে মূলতঃ তার বাবা বা মা সাপুড়ের উপস্থিতির কারণেই সাপ তখন শিশুটিকে দংশন করে না। এভাবে শিশু সাপ ধরতে ধরতে বড় হয় এবং ক্রমান্বয়ে তার নাফ্‌স্‌ও তারা বাবা-মা' র মতোই শক্তি ও সাহসের অধিকারী হয়ে ওঠে, অতঃপর কৈশোরে বা যৌবনে সে একাই সাপ ধরতে সক্ষম হয়।

ধ্যানে বসে অজানা তথ্য প্রদান

অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাঁরা ধ্যানে বসে অতীতের অনেক ঘটনাবলী বলে দিয়েছেন অথবা তাঁদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত কোনো কিছু বা কোনো মানুষ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন - যে সম্পর্কে তাঁদের আদৌ জানা না থাকার বিষয়টি অকাট্য। এটা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নাফসের

ইন্দ্রিয়নিচয়ের কর্মক্ষমতার আওতা ও মাত্রা বৃদ্ধিরই প্রমাণ বহন করে, অবশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহেই কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারে।

প্রায়মৃত্যুর অভিজ্ঞতা

প্রায়মৃত্যুর অভিজ্ঞতা (Near Death Experience) অর্জন করেছে এমন লোকদের বর্ণনা থেকেও ব্যক্তিসত্তার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেবল নাফসের ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্যে পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা জানা যায় - যা ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বস্তুদেহ থেকে মুখাপেক্ষিতাহীনতার প্রমাণ বহন করে।

প্রায়মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অধিকারী অনেক লোক অচেতন থাকার পর চেতনা ফিরে পেয়ে স্বীয় অস্ত্রোপচারের বিস্তারিত ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তার ও নার্সদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তার বর্ণনাও দিয়েছে। তারা আরো বলেছে যে, এ সময় তারা অস্ত্রোপচারের খাটে শোয়ানো তাদের বস্তুদেহ দেখেছে এবং একই সাথে তারা নিজেদেরকে এক ধরনের হাল্কা শরীরের অধিকারী অবস্থায় অস্ত্রোপচারকক্ষের সিলিং সংলগ্ন হয়ে ভাসমান অবস্থায় দেখেছে। আর ঐ অবস্থায় তারা অস্ত্রোপচারের পুরো ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছে এবং সকল কথাবার্তা শুনেছে। আর তাদের সে সব বর্ণনা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদেরকে হাল্কা শরীর সহকারে আকাশে উড়তে দেখেছে এবং কেউ কেউ নিজেকে

কোনো এক অচেনা জগতে প্রবেশ করতে ও অনেক চেষ্টায় ফিরে আসতে দেখেছে।

এ ধরনের ঘটনাবলী বস্তুবিজ্ঞানীদের সামনে এমন এক প্রশ্ন তুলে ধরেছে যার জবাব তাঁদের জানা নেই। তবে ইতিপূর্বে যে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির কথা বলা হয়েছে তা থেকে এর জবাব মিলে, তা হচ্ছে, মানুষ সহ সকল প্রাণশীল ও সজীব অস্তিত্বেরই বস্তুদেহ ছাড়াও একটি আলোর দেহও রয়েছে এবং সন্দেহ নেই যে, প্রায় অবস্তুগত অস্তিত্ব এ আলোর দেহই হচ্ছে নাফ্স্ অথবা অবস্তুগত নাফসের ধারক।

আলামে বারযাখ্ ও ‘আলামে মিছাল্

দার্শনিক ও ‘আ্যারেফ্গণ মৃত ব্যক্তিদের দেহাতীত সত্তার জগত ‘আলামে বারযাখ্ ছাড়াও আরো একটি বারযাখী জগতের কথা বলেছেন। একে তাঁরা ‘আলামে মিছাল্ বা বারযাখে মিছালী বলে উল্লেখ করেছেন।

‘আ্যারেফ্কুল শিরোমণি হযরত শায়খ্ মুহীউদ্দীন ইব্নুল্ ‘আরাবী (রহ্.) বলেছেন যে, “বারযাখ্” পরিভাষাটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয় : একটি হচ্ছে তা-ই পার্থিব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর রূহ্ (নাফ্স্) সমূহকে যেখানে রাখা হয়; এটা ঐ বারযাখ্ থেকে স্বতন্ত্র - যা মুজাররাদ্ রূহ্ সমূহ ও বস্তুগত শরীর সমূহের মাঝামাঝি। (شرح فصص محی الدین ابن العربی، ص ٣٢)

উল্লেখ্য, দার্শনিক ও ‘আ্যারেফ্গণ বস্তুসম্পর্কহীন স্বাধীন আত্মিক সত্তাসমূহকে (যেগুলো বস্তুদেহে উদ্ভূত নয়) মুজাররাদ্ (مجرد) বা বস্তুসম্পর্কহীন সত্তা বলে থাকেন, যেমন : ফেরেশতাগণ। এ ধরনের সত্তাকে রূহে মুজাররাদ্-ও বলা হয়। এ ধরনের সত্তাসমূহের জগতকে ‘আলামে মুজাররাদ্ (عالم مجرد - অবস্তুগত সত্তার জগত) বা ‘আলামে আরওয়াহ্ (عالم ارواح - রূহের জগত) বলা হয়। এ জগতের ও তার অধিবাসীদের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাদের অবস্থানের জন্য কোনো বস্তু সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখলের প্রয়োজন হয় না।

দার্শনিক ও 'আারেফ্গণের মতে, এই 'আালামে মুজাররাদ্ ও বস্তুজগতের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত আরেকটি জগত রয়েছে; এ জগতের নাম 'আলামে মিছাল্ বা 'আলামে বারযাখ্ বা বারযাখে মিছালী। এ জগতের সৃষ্টিনিচয় বস্তুগত সৃষ্টিও নয়, আবার পুরোপুরি মুজাররাদ্ও নয়, বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি ধরনের তথা এক ধরনের সূক্ষ্ম উপাদানে সৃষ্ট।

মৃত্যর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগতকে দু'টি কারণে 'আালামে বারযাখ্ বলা হয়। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাঝামাঝি জগত তথা পার্থিব জগত ও আখেরাতের জগতের মাঝামাঝি জগত, দ্বিতীয়তঃ সেখানে মানুষের নাফ্স্ বস্তুদেহবিহীন কিন্তু মিছালী শরীর (জিসমে মিছালী) সহ অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই কি, তাঁরা যেমন বলেছেন, উপরোল্লিখিত 'আালামে মিছাল ও মৃত ব্যক্তিদের নাফসের জগত অর্থাৎ 'আালামে বারযাখ্ স্বতন্ত্র, নাকি অভিন্ন?

বলা বাহুল্য যে, বস্তুজগতে জীবিত মানুষ জাগ্রত অবস্থায়ও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন গতিবিধির অধিকারী নয়, বরং প্রাকৃতিক, আইনগত, বস্তুগত, বিশেষতঃ আর্থিক এবং সামাজিক ও নৈতিক বাধা তার গতিবিধি ও তৎপরতাকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 'আলামে বারযাখে অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জগতে নাফ্স্ সমূহের গতিবিধি ঐ জগতের জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিধিবিধানের আওতায় ফেরশতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য নবী-রাসূলগণ

(‘আঃ) সহ আল্লাহ্ তা‘আলার খাছ্ব্ বান্দাহ্গণ যে ঐ জগতে সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রার স্বাধীনতা ভোগ করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং পাপিষ্ঠরা যে বলতে গেলে কোনোই স্বাধীনতা লাভ করবে না এতেও সন্দেহ নেই। অন্য ব্যক্তিরা তাদের অবস্থা অনুযায়ী স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতার অধিকারী হবে - এটাই বিচারবুদ্ধির দাবী।

অন্যদিকে দার্শনিক ও ‘আারেফ্গণ যে ‘আালামে মিছাল্-এর কথা বলেছেন সে জগতও নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জগত হতে পারে না। বরং তা-ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি, নৈতিকতা, অতিপ্রাকৃতিক বিধি-বিধান ও ফেরেশতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জগত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে যে, এ দু’টি জগত কি বিভিন্ন, নাকি অভিন্ন?

আল্লাহ্ তা‘আলা কোরআন মজীদে মৃত ও ঘুমন্ত উভয় ধরনের লোকদের নাফসকে অধিগ্রহণ করেন (يتوفّى) বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ জন্য অভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে ফিরিয়ে দেন এবং মৃত ব্যক্তির নাফসকে ফিরিয়ে দেন না। এ ক্ষেত্রে উভয়ের অধিগ্রহণের জন্য অভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহারের কারণে এটা ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না যে, উভয় ব্যক্তির নাফসকে অভিন্ন জগতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একেই অধিগ্রহণ করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটাই স্বাভাবিক যে, উভয় ধরনের নাফসকে একই জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাখা হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ স্বপ্নে জীবিত ও মৃত উভয় ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ পায় কীভাবে?

মৃত ব্যক্তিদের নাফ্‌স্‌ ফেরেশতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'আালামে বারযাখে রাখা হয় এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় মৃত ও ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে অভিন্ন জগতে নেয়া না হলে জীবিত ব্যক্তিদের নাফসের পক্ষে মৃত ব্যক্তিদেরকে দেখা সম্ভব হতে পারে না। কারণ, দার্শনিক ও 'আারেফ্‌গণ বর্ণিত সূক্ষ্ম সৃষ্টির জগত বা 'আালামে মিছাল্‌ স্বতন্ত্র হলে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে সেখানে নিয়ে রাখা হলে সেখানে তাকে যদি মৃত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করাতে হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির নাফসকে 'আালামে বারযাখ্‌ থেকে কথিত 'আালামে মিছালে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বিচারবুদ্ধি এটাকে সঠিক বলে মানতে পারে না। কারণ, তাহলে 'আালামে বারযাখের সীমান্ত তথা সীমাবদ্ধতার প্রাচীর (যদিও অবস্তুগত) লঙ্ঘিত হবে। বরং ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফসকে মৃত ব্যক্তিদের নাফসের জগতেরই একটি অংশে নিয়ে গেলে এ সীমারেখা ও সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘিত হয় না।

এখানে একটি নতুন প্রশ্নের উদয় হতে পারে, তা হচ্ছে, মানুষ স্বপ্নে শুধু মৃত লোকদেরকেই দেখতে পায় না, বরং অন্য জীবিত লোকদেরকেও দেখতে পায় এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে ও অন্য ধরনের আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। কিন্তু হতে পারে যে, যে ব্যক্তিকে সে স্বপ্নে দেখেছে সে ব্যক্তি ঐ সময় জাগ্রত ছিলো অথবা ঘুমিয়ে থাকলেও সে হুবহু একই রকম স্বপ্ন দেখে নি।

এর মানে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ তখন ‘আলামে বারযাখে বা ‘আলামে মিছালে যায় নি, বা গেলেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাফসের সাথে মুখোমুখি হয় নি। তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কী করে তাকে দেখতে পায়? দার্শনিক ও ‘আরেফ্‌গণের পক্ষ থেকে এর জবাবে যে সব সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য জবাব হচ্ছে এই যে, ‘আলামে মিছালে বস্তুজগতের প্রাণশীল ও নিষ্প্রাণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিরই সদৃশ রূপ (صورت مثالی) রয়েছে এবং সেখানে তাদের তৎপরতাও রয়েছে। আর সে তৎপরতা কেবল স্বপ্নযোগেই ঘটে না, বরং জাগ্রত অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে যে সব চিন্তা-চেতনা দেখা দেয় এবং সে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা পোষণ করে, তেমনি সে যা কিছু কল্পনা করে তার সব কিছুই ‘আলামে মিছালে অবস্তুগত মূর্ত রূপ লাভ করে তথা তৎপরতায় পরিণত হয়, যদিও ব্যক্তি নিজে সে সম্পর্কে বুঝতে পারে না। অন্যদিকে ঘুমন্ত ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ যেমন জাগ্রত অবস্থায় যে সব চিন্তা ও কল্পনা করতো এবং যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা পোষণ করতো সেগুলোও ‘আলামে মিছালে অবস্তুগত মূর্ত রূপ লাভ করে তথা তৎপরতায় পরিণত হয়। ব্যক্তির নাফ্‌স্‌ ঘুমের মধ্যে প্রধানতঃ নিজের এবং সেই সাথে অন্যদের কতক চিন্তা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার অবস্তুগত মূর্ত রূপের মুখোমুখি হয় ও তা পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়া উপস্থিতভাবেও সে সেখানে কতক তৎপরতা চালায়। অতঃপর তার নাফ্‌স্‌ মিছালী দেহ সহকারে,

মতান্তরে মিছালী দেহ থেকে বের হয়ে, বস্তুদেহে ফিরে আসে। আর তখনই সে জাগ্রত হয়।

[উল্লেখ্য, ‘আারেফ্গণের দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বলোককে এক বিবেচনায় তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) عالم لاهت - ‘আালামে লাহূত্ বা আল্লাহ্ তা‘আলার নিজ সত্তার রহস্যলোক - যা জানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। (২) عالم ناسوت - ‘আালামে নাসূত্ বা বস্তুজগত। (৩) عالم ملكوت - ‘আালামে মালাকূত বা অবস্তুলোক।

‘আালামে মালাকূত্ আবার তিন ভাগে বিভক্ত : (ক) ملكوت اعلى - মালাকূতে আ ‘লা বা উচ্চতর অবস্তুলোক; ফেরেশতাগণ সহ সকল বস্তুসম্পর্কহীন নাফ্স্ ও রূহ্ এ জগতের অন্তর্ভুক্ত। (খ) ملكوت سفلى - মালাকূতে সুফলা বা নিম্ন স্তরের মালাকূত্; মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও পরিকল্পনা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। (গ) ملكوت وسطى - মালাকূতে উসত্বা বা মধ্যবর্তী মালাকূত্; বস্তুগত অস্তিত্বের কাছাকাছি সূক্ষ্ম অস্তিত্বসমূহ এ জগতের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে কোরআন মজীদের আয়াতে প্রতিটি জিনিসেরই মালাকূত্ আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

“অতএব, পরম প্রমুক্ত তিনি (আল্লাহ্) যার হাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের (شَيْءٍ) মালাকূত্ এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনরত।” (সূরাহ্ ইয়া-সীন্ : ৮৩)

বস্তুতঃ অন্য কোনো নিদর্শন না থাকলে شَيْءٍ বলতে বস্তুগত সৃষ্টিকে বুঝায় - তা তাতে প্রাণ থাকুক বা না-ই থাকুক। অতএব, বস্তুলোকের প্রাণশীল ও প্রাণহীন নির্বিশেষে প্রতিটি সৃষ্টিরই মালাকূত্ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ মালাকূত্ কী? তা কি ‘আলামে মিছালস্থ সদৃশ আকৃতি (صورت مثالى) এবং তা-ই কি নাফ্স্? কারণ, আমরা যে সব সৃষ্টিকে নিষ্প্রাণ মনে করি কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে সেগুলোরও প্রাণ আছে তা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।]

অনুরূপভাবে, কোনো কোনো মতে, পার্থিব জগতে মানুষ যে সব ভালো-মন্দ চিন্তা-পরিকল্পনা ও কাজকর্ম করে এবং যে সব ভালো-মন্দ কথা বলে তা অবস্তুগত মূর্ত রূপ (صورت مثالى) ধারণ করে ‘আলামে মিছালে এবং বস্তুগত বা উচ্চতর রূপ (صورت اعلى) নিয়ে ‘আলামে আখেরাতে মওজূদ হতে থাকে। যেমন : অনেক ভালো চিন্তা-পরিকল্পনা, কথা ও কাজ তার জন্য প্রাসাদ, স্নিগ্ধ হাওয়া, সুপেয় পানি, সুস্বাদু খাবার, ফলবান বৃক্ষ, ফুলের গাছ, পাখীর সুর ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং তার বস্তুগত মূর্ত রূপ ‘আলামে আখেরাতে ও অবস্তুগত মূর্ত রূপ ‘আলামে মিছালে বা ‘আলামে বারযাখে স্থানলাভ করে। তেমনি তার অনেক মন্দ চিন্তা-পরিকল্পনা, কথা ও কাজ আগুন, কঠিন

শৈত্য, সাপ-বিচ্ছু, নোংরা ও অপবিত্র বস্তু ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং তার বস্তুগত মূর্ত রূপ 'আলামে আখেরাতে ও অবস্তুগত মূর্ত রূপ 'আলামে মিছালে বা 'আলামে বারযাখে স্থানলাভ করে। তেমনি অন্য লোকেরা তার জন্য ভালো বা মন্দ যে সব চিন্তা বা পরিকল্পনা করে তা-ও প্রতীকীভাবে বস্তুগত ও অবস্তুগত মূর্ত রূপ ধারণ করে যথাক্রমে 'আলামে আখেরাতে ও 'আলামে বারযাখে বা 'আলামে মিছালে স্থিতিলাভ করে।

এ কারণেই ব্যক্তি স্বপ্নে যে সব সুখকর অভিজ্ঞতা লাভ করে তা প্রধানতঃ তার নিজের সুকর্ম ও সুচিন্তা-পরিকল্পনার অথবা অন্যরা তার জন্য যে সুচিন্তা-পরিকল্পনা করে তার অবস্তুগত মূর্ত রূপ। অন্যদিকে সে স্বপ্নে যে সব অসুখকর বা কষ্টকর অভিজ্ঞতা লাভ করে তা প্রধানতঃ তার নিজের মন্দ কর্ম ও মন্দ চিন্তা-পরিকল্পনার অথবা অন্যরা তার জন্য যে মন্দ ও ক্ষতিকর চিন্তা-পরিকল্পনা করে তার অবস্তুগত মূর্ত রূপ। (এখানে 'প্রধানতঃ' বলার কারণ এই যে, ক্ষেত্রবিশেষে এর বাইরে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার অবস্তুগত মূর্ত রূপও অন্তর্ভুক্ত থাকে।)

স্বপ্নলোকে সুখ-শান্তি, ভোগ-আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট একটি বিতর্কাতীত ব্যাপার। এ সময় মানুষের বস্তুদেহের পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকলেও সে পুরোপুরি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়। বস্তুতঃ স্বপ্নলোকে সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং জাগ্রত অবস্থার সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে কোনোই পার্থক্য নেই। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে স্বপ্নে সুখ-দুঃখের অনুভূতি এমনই তীব্র হতে পারে যে,

এর ফলে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে এবং এ ধরনের ঘটনা একান্ত বিরল হলেও ঘটতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের নাফসকে অনুরূপ বা মাত্রাগতভাবে তার চেয়েও তীব্রতর অনুভূতি প্রদান করে পুরষ্কার ও শাস্তি আস্বাদন করানোর বিষয়টি কেবল কোরআন মজীদের আয়াতের আলোকেই নয়, বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতেও অনস্বীকার্য।

সুতরাং 'আলামে বারযাখে নে 'আমত্ ও শাস্তি যাকে যা-ই ভোগ করানো হোক না কেন, তা প্রকৃতই ভোগ বৈ নয়। তবে তাতে বস্তু থাকে না, কিন্তু বস্তুমধ্যস্থ প্রকৃত ভোগোপকরণ সমূহের (ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই) সবই থাকে। অর্থাৎ তাতে বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শ সবই থাকে। তবে 'আলামে বারযাখে খাদ্যদ্রব্যজাত পুষ্টি ও শক্তি নাফ্স্ বা জিসমে মিছালীর জন্য অপরিহার্য বলে মনে হয় না।

অবশ্য বস্তুবিহীন নিরঙ্কুশ স্বাদ এবং তা-ও নে 'আমত্ সমূহের আকার-আকৃতি সহ সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে একটি দুর্বল উপমা (مثال ناقص) থেকে বিষয়টি বুঝতে পারা সহজ হতে পারে। তা হচ্ছে, আমরা বিভিন্ন ধরনের রঙ্গিন বস্তু দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এর বাইরেও শুধু রং পাওয়া যায় - যা অন্য বস্তুকে আশ্রয়কৃত রং নয়, বরং শুধুই রং।

বারযাখী জীবনের স্বরূপ

আসলে মৃত্যুপরবর্তী 'আলামে বারযাখের প্রকৃত অবস্থা কেমন? এ প্রশ্নের জবাব জানার আগ্রহ সকলেরই। কিন্তু এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব প্রদান করা

কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, এ জগতের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা সহকারে কোনো ব্যক্তিই ফিরে আসে না এবং তার বর্ণনা দেয় না। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কারণে যদি কাউকে পুনরায় পার্থিব জীবনে ফিরিয়ে দেন - ঠিক যেভাবে হযরত 'উযাইর্ ('আঃ)কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন - তো সে ক্ষেত্রেও তার পক্ষে 'আলামে বারযাখের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, মানুষ 'আখেরাত্ ও 'আলামে বারযাখের ব্যাপারে কোনোরূপ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াই কেবল বিচারবুদ্ধি ('আক্বল্)-এর সাহায্যে পর্যালোচনা করে সত্যে উপনীত হয়ে ঈমান পোষণ করুক, সেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, কাউকে মৃত্যুর পরে পুনরায় পার্থিব জীবনে ফিরিয়ে দিলে তার 'আলামে বারযাখের স্মৃতিগুলোকে অবচেতনে পাঠিয়ে দেয়া হবে - যার ফলে ব্যক্তির মনেই হবে না যে, সে মারা গিয়েছিলো, বরং মনে হবে যে, সে ঘুমিয়ে ছিলো বা সংজ্ঞাহারা হয়ে ছিলো। এ কারণেই 'উযাইর্ ('আঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশ্ন ও তাঁর জবাব থেকে সুস্পষ্ট যে, 'উযাইর্ ('আঃ) বুঝতেই পারেন নি যে, তিনি মারা গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'উযাইর্ ('আঃ)কে যে প্রশ্ন করেন তাতে সরাসরি তাঁর মৃত অবস্থার কথা উল্লেখ করেন নি, বরং জিজ্ঞেস করেন : كَمْ لَبِثْتَ - "কতোদিন (এভাবে/ মৃত) ছিলে?" জবাবে 'উযাইর্ ('আঃ) বলেন : لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ - "একদিন বা একদিনের অংশবিশেষ (এভাবে/ ঘুমিয়ে) ছিলাম।" আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গাধাটির জরাজীর্ণ অস্থিসমূহ দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে

দেন যে, তিনি অনেক দিন (একশ’ বছর) মৃত অবস্থায় ছিলেন। (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২৫৯)

যা-ই হোক, যেহেতু ‘আলামে বারযাখ্ নাফসের জগত বা সূক্ষ্ম শরীর সহ নাফসের জগত সেহেতু অনেকে মনে করেন যে, এ জগতের রূপ খুবই হাল্কা দৃশ্য সম্বলিত অর্থাৎ প্রায় অদৃশ্য।

কিন্তু এ মত সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, স্বপ্নে আমরা যা কিছু দেখি তা ‘প্রায় অদৃশ্য’ নয়, বরং সুস্পষ্ট। আর ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, স্বপ্নলোক ‘আলামে বারযাখেরই একটি অংশ, সুতরাং স্বপ্নলোকের দৃশ্যাবলী যেহেতু সুস্পষ্ট সেহেতু ‘আলামে বারযাখের দৃশ্যাবলীও অবশ্যই সুস্পষ্ট। তবে আমরা যেহেতু ‘আলামে বারযাখের অবস্থা অবলোকন করার মতো যোগ্যতা ও অনুমতির অধিকারী নেই সেহেতু সে জগত আমাদের কাছে অদৃশ্য, কিন্তু যারা তা অবলোকন করার মতো যোগ্যতা ও অনুমতির অধিকারী তাঁদের কাছে তা অদৃশ্য নয়।

অনেক ইসলামী মনীষী ‘আলামে বারযাখকে আয়নায় পতিত দৃশ্যের সাথে তুলনা করেছেন - যাতে সুস্পষ্টতার কোনোই কমতি নেই, কিন্তু তাতে বস্তু নেই; বস্তু ছাড়া সব কিছুই আছে। এ তুলনাটি সঠিক বলে মনে হয়।

অনেক ইসলামী মনীষীর মতে, সুস্পষ্টতার বিচারে ‘আলামে বারযাখ্ পার্থিব জীবনের চেয়ে উন্নততর। তাঁদের মতে, ‘আলামে বারযাখের তুলনায় পার্থিব জগত হচ্ছে নিদ্রাতুল্য। কারণ, পার্থিব জীবনে মানুষের জ্ঞানচক্ষুর কার্যক্ষমতা

বিভিন্ন কারণে সীমিত হয়ে পড়ে, কিন্তু 'আলামে বারযাখে এ ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। পার্থিব জীবনে নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি ও বিস্মৃতি আছে, কিন্তু 'আলামে বারযাখে তা নেই। তাছাড়া মানুষ পার্থিব জীবনে 'আলামে বারযাখের জ্ঞান রাখে না, কিন্তু 'আলামে বারযাখের জীবনে মানুষ স্বীয় অতীত জীবন, বর্তমান 'আলামে বারযাখ্ ও বর্তমান বস্তুজগত সম্বন্ধে অবগত থাকে। (অবশ্য ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, 'আলামে বারযাখের অধিবাসীরা স্বীয় অতীত ব্যতীত পার্থিব জীবন সম্পর্কে কতোখানি জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে তা নির্ভর করে তাদেরকে প্রদত্ত সুযোগ বা অনুমতির ওপর।)

বস্তুতঃ একজন নিদ্রিত ব্যক্তি ও একজন জাগ্রত ব্যক্তির মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য এই যে, জাগ্রত ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারে, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি তা পারে না। তাই 'আলামে বারযাখের জীবনে যেহেতু পার্থিব জীবনের তুলনায় জ্ঞানের পরিধি বেশী থাকে সেহেতু পারস্পরিক তুলনায় পার্থিব জগতের মোকাবিলায় 'আলামে বারযাখের জীবনকে ঘুমন্ত ব্যক্তির তুলনায় জাগ্রত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে পুনরুত্থানপরবর্তী জীবনে মানুষের জ্ঞানচক্ষু পুরোপুরি উন্মীলিত হয়ে যাবে। তখন কারো কাছে অজানা বলে কিছু থাকবে না। অর্থাৎ 'আলামে বারযাখের তুলনায় সে জীবনে জ্ঞানের পরিধি হবে আরো বেশী। এ কারণে হাশরের জীবন হবে পূর্ণ জাগ্রত জীবন এবং সে তুলনায় 'আলামে বারযাখের

জীবন হচ্ছে নিদ্রিত অবস্থা। ফলে মৃত্যুর পরে ব্যক্তির এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সে পার্থিব জীবনে আসলে ঘুমিয়ে ছিলো এবং মৃত্যুর মাধ্যমে সে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠেছে। তেমনি পুনরুত্থানের পর তার মনে হবে যে, সে 'আলামে বারযাখে নিদ্রিত ছিলো; পুনরুত্থানের মাধ্যমে সে নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে।

এ তুলনাটি আরেকভাবেও করা হয়েছে। 'আলামে বারযাখের জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন মৃত অবস্থার সমতুল্য। অর্থাৎ 'আলামে বারযাখের জীবনে ব্যক্তির মনে হয় যে, পার্থিব জীবনে আসলে সে মৃত ছিলো এবং পার্থিব পরিভাষায় যাকে মৃত্যু বলা হয় তার মাধ্যমে সে কার্যতঃ জীবন লাভ করেছে। আর পুনরুত্থানের পর 'আলামে বারযাখের জীবন সম্পর্কেও তার অনুরূপ অনুভূতি হবে।

যারা তিন জীবনের (পার্থিব, বারযাখী ও আখেরাতের) মধ্যে এভাবে তুলনা করেছেন তাঁদের মতে, কোরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াত্ থেকে তাঁদের এ মতের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়।

বিশেষ করে আখেরাতের জীবন যে পার্থিব জীবনের তুলনায় সীমাহীনভাবে ব্যাপকতর ও গভীরতর এবং স্থায়ী জীবন কোরআন মজীদে তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

"আর এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ নয়: নিঃসন্দেহে পরকালের আবাসস্থল হচ্ছে প্রাণশীল; যদি তারা জানতো!" (সূরাহ্ আল্-'আনকাবূত্ : ৬৪)

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পার্থিব জীবনে আমরা আমাদের আবাসস্থলে ও বস্তুগত উপায়-উপকরণে প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি না, কিন্তু আখেরাতের জীবনে অজ্ঞতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন আমরা সব কিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব দেখতে পাবো। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আখেরাতের জীবন্ত জগতের তুলনায় এ পার্থিব জগত একটি মৃতপুরীর সমতুল্য বৈ নয়।

তাঁদের মতে, অন্য এক আয়াত থেকে তিনটি জীবনের অস্তিত্বের ধারণার প্রতি সমর্থন মিলে। এরশাদ হয়েছে :

(قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ)

"(শেষ বিচারের দিনে) তারা (কাফেররা) বলবে : হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দুই বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দুই বার জীবিত করেছেন। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের গুনাহ্ সমূহ স্বীকার করছি; অতঃপর (আমাদের জন্য) নিষ্ক্রান্তির কোনো পথ আছে কি?" (সূরাহ্ আল্-গ্বাফির্/ আল্-মু' মিন্ : ১১)

তাঁদের মতে, এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে দুই বার মৃত্যু বলতে পার্থিব জীবনের মৃত্যু তথা 'আলামে বারযাখে স্থানান্তর এবং 'আলামে বারযাখের জীবনের মৃত্যু তথা আখেরাতে প্রবেশ বুঝানো হয়েছে, তেমনি মৃত্যুর পরে জীবিতকরণ বলতে যথাক্রমে পার্থিব জীবনের মৃত্যুর পরে 'আলামে বারযাখের

জীবন দান এবং ‘আলামে বারযাখের জীবনের অবসান ঘটিয়ে আখেরাতে নতুন জীবন দান বুঝানো হয়েছে।

তবে অনেকের মতে, আত্মিক দৃষ্টিতে তথা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের দৃষ্টিতে, প্রথম বার মৃত্যুদান বলতে জ্ঞানবিহীন অবস্থায় পার্থিব জীবনে প্রেরণ ও প্রথম বার জীবিতকরণ বলতে পার্থিব দেহের মৃত্যুর মাধ্যমে ‘আলামে বারযাখের জীবন প্রদান এবং দ্বিতীয় বার মৃত্যু বলতে ‘আলামে বারযাখের জীবন প্রদান ও দ্বিতীয় বার জীবিতকরণ বলতে আখেরাতে পুনর্জীবিতকরণ বুঝানো হয়েছে।

এ দু’টি মত অনুযায়ী, এখানে দুই বার মত্যুর কথা উল্লেখ থেকে আরো একটি সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে, ক্বিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সময় প্রথমে পার্থিব জগতকে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরপর ‘আলামে বারযাখ্ সহ নাফসের জগতসমূহকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। তখন মিছালী দেহ সহ নাফ্স্ (ব্যক্তিসত্তা) সমূহও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ)

“তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই; তাঁর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।” (সূরাহ্ আল্-ক্বাছ্বাছ্ব্ : ৮৮)

তাঁরা মনে করেন যে, ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে। এমনকি এরূপ বর্ণনাও রয়েছে যে, সবশেষে ‘আযরা ‘ঈল্ (‘আঃ) তাঁর নিজের জান ক্বয্ করবেন। এর মানে হচ্ছে, ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে। আর যেহেতু ‘আলামে বারযাখের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সন্দেহাতীতভাবেই ফেরেশতাদের হাতে সেহেতু

ফেরেশতাদের অবর্তমানে ‘আলামে বারযাখের অস্তিত্ব টিকে থাকা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। অতএব, এমতাবস্থায় ‘আলামে বারযাখের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অনিবার্য। অর্থাৎ এ ঘটনা হবে ‘আলামে বারযাখে অবস্থানরত নাফ্স্ বা ব্যক্তিসত্তাদের জন্য পরিপূর্ণ মৃত্যু। অতঃপর একমাত্র মহান ‘আল্লাহ্ রাব্বুল্ ‘আলামীনের সত্তা ছাড়া আর কিছুই ও কেউই থাকবে না।

অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, ইতিপূর্বেকার আয়াতে উল্লিখিত দুই বার মৃত্যু ও দুই বার জীবন প্রসঙ্গটি সর্বজনীন নয়, বরং এটা হচ্ছে সেই সীমিত সংখ্যক কাফেরদের কথা যাদের পার্থিব জীবনের মৃত্যুর পর হযরত ইমাম মাহ্দী (‘আঃ) আত্মপ্রকাশের পর তাদেরকে জীবিত করবেন ও শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং ক্বিয়ামতের ধ্বংসের বিষয়টি পার্থিব জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘আলামে বারযাখ্ বা ‘আলামে মিছালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং ফেরেশেতাদেরও মৃত্যু হবে না।

তাঁদের মতে, ওপরের আয়াতে شَيْء-এর ধ্বংসশীলতার কথা বলা হয়েছে, আর شَيْء বলতে বস্তুগত অস্তিত্বকে বুঝানো হয়, সুতরাং ফেরেশতামণ্ডলী ও ‘আলামে বারযাখ্ ধ্বংস হওয়ার কথা বুঝানো হয় নি। অন্য মত অনুযায়ী, যেহেতু আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, সেহেতু ফেরেশতারা ও ‘ আলামে বারযাখ্ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী, এখানে কা’ রা ধ্বংস হবে তা-ই বুঝানো উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ্ যে অবিনশ্বর তা স্মরণ

করিয়ে দেয়া হয়েছে; এর বাইরে আর কী কী ধ্বংস হবে না তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয় নি; আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ ধরনের প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তাই ফেরেশতা, 'আলামে বারযাখ্ ও আরো যতো অবস্তুগত সৃষ্টি আছে তার কথা উহ্য রাখা হয়েছে।

এছাড়া লোকদেরকে তাদের ক্ববর থেকে হাশরের মাঠে উত্থিত করা হবে। এরশাদ হয়েছে :

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا)

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তখন তারা তাদের ক্ববরসমূহ থেকে তাদের রবের পানে ছুটে আসবে। তখন তারা বলবে : হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করলো!" (সূরাহ্ ইয়া-সীন্ : ৫১-৫২)

বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদে ক্ববর বলতে মাটির ক্ববরকে বুঝানো হয় নি, কারণ, সকলের মাটির ক্ববর হয় না। তাছাড়া এ পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন মাটির ক্ববর সমূহের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, এখানে ক্ববর থেকে রবের পানে ছুটে যাওয়া বলতে সরাসরি 'আলামে বারযাখ্ থেকে নবসৃষ্ট পৃথিবীর বুকে উত্থিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কাফেররা যে দুই বার মৃত্যু ও দুই বার জীবন দানের কথা বলবে তা কেবল সেই কাফেরদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও তাদের কথা হবার

সম্ভাবনাই বেশী যাদেরকে হযরত ইমাম মাহ্দী ('আঃ) জীবিত করে শাস্তি প্রদান করবেন।

আরো একটি কারণে এ মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। তা হচ্ছে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হলে তখন বস্তুজগত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই সাথে মানুষ সহ এর ওপরকার সকল প্রাণী নিহত হবে। একই সাথে যদি 'আলামে বারযাখ্ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ফেরেশতারাও মৃত্যুবরণ করে তাহলে বস্তুজগত ধ্বংসের সময় যারা মারা যাবে তাদের বারযাখী জীবন হবে না এবং সে জীবনের শাস্তি ও পুরষ্কারও তারা পাবে না এবং ক্ববর অর্থাৎ 'আলামে বারযাখ্ থেকে হাশরের মাঠে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিও তাদের বেলা কার্যকর হবে না। কিন্তু কোরআন মজীদে সকলেরই ক্ববর থেকে হাশরের মাঠে উঠে আসার কথা বলা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমের কথা বলা হয় নি। এ থেকেও উপসংহারে আসতে হয় যে, ক্বিয়ামতে কেবল বস্তুজগত ধ্বংস হবে ও তার প্রাণীকুল নিহত হবে; 'আলামে বারযাখ্ ধ্বংস হবে না এবং ফেরেশতা সহ আল্লাহ্ তা'আলার অবস্তুগত সৃষ্টিসমূহ মৃত্যুবরণ করবে না।

'আলামে বারযাখকে 'আলামে মিছাল্ বা সদৃশ জগত কেন বলা হয় - এ সম্পর্কে অনেক ইসলামী মনীষীর মত হচ্ছে এই যে, 'আলামে বারযাখের একই সাথে পার্থিব জগত ও আখেরাতের জগতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই একে 'আলামে মিছাল্ বলেও অভিহিত করা হয়।

বস্তুতঃ আখেরাতের জগত বহুলাংশেই পার্থিব জীবনের অনুরূপ। আখেরাতের জীবন হবে দেহ ও নাফসের সমন্বিত জীবন; ঠিক পৃথিবীর জীবনের মতোই। তবে আখেরাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী এবং তা হবে পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ কর্মের ফলাফল লাভের জীবন। তাছাড়া সেখানে কোনো সত্য গোপন থাকবে না এবং সেখানে নৈতিক ফলাফলের পরিপূর্ণ প্রতিফলনের পথে সামান্যতম বাধাও থাকবে না। কিন্তু গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে আখেরাতের জগত পার্থিব জগতের অনুরূপ হবে।

অন্যদিকে 'আলামে বারযাখ্ একটি পুরোপুরি ভিন্ন মাত্রার জগত অর্থাৎ অবস্তুগত জগত। কিন্তু সেখানকার সব কিছু আকার-আকৃতির দিক থেকে পার্থিব জগত ও আখেরাতের জগতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জগত, তবে তা অবস্তুগত। সুখ-দুঃখ ও উপায়-উপকরণের দিক থেকেও সে জগত পার্থিব জগত ও আখেরাতের জগতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও বস্তুগত নয়। এছাড়া 'আলামে বারযাখে নৈতিক বিধানের ফলাফল থেকে বেঁচে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, ঠিক আখেরাতের জগতের ন্যায়ই। তেমনি পার্থিব জগতে যে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা আছে 'আলামে বারযাখে তা ঘুচে যাবে এবং এদিক থেকে তার আখেরাতের জীবনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও আখেরাতের জীবনের ন্যায় তা পরিপূর্ণ জ্ঞানের জগত নয়। তাছাড়া আখেরাতের জীবনে যেমন পার্থিব জীবনের আমল অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের বেহেশত ও দোযখ রয়েছে তেমনি 'আলামে বারযাখের জীবনেও বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য

বিভিন্ন স্তরের পুরষ্কার ও শাস্তি তথা বিভিন্ন স্তরের বারযাখী বেহেশত ও দোযখ রয়েছে।

এ সকল দিক বিবেচনা করেই 'আলামে বারযাখকে 'আলামে মিছাল্ বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, 'আলামে বারযাখের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষের পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আমল সমূহ বিভিন্ন ধরনের রূপক মূর্ত রূপ ধারণ করে 'আলামে বারযাখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাফসের সঙ্গীরূপে তার সাথে অবস্থান করে তার সুখ-দুঃখের কারণ হবে। যেমন : দুনিয়ার বুকে যার স্বভাব ছিলো নিষ্ঠুর, কুটিল ও হিংস্র সাপের স্বভাব তার এ স্বভাব বিষধর সাপরূপে 'আলামে বারযাখে তার সাথী হবে এবং তাকে দংশন করতে থাকবে। বলা বাহুল্য যে, সে সাপ বস্তুগত দেহের অধিকারী হবে না, বরং ঐ ব্যক্তির নাফসের ন্যায়ই অবস্তুগত দেহের অধিকারী হবে। অন্যদিকে, বিভিন্ন সূত্রের হাদীছ অনুযায়ী, দুনিয়ার জীবনে যারা নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত্ করেন, কোরআনকে ভালোবাসেন, কোরআনের হুকুম পালন করে চলেন ও কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করেন 'আলামে বারযাখে কোরআন অবস্তুগত মূর্ত রূপ ধারণ করে, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, একজন সুদর্শন যুবক রূপে, অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে তাঁকে সাহচর্য দেবে এবং তাঁর বারযাখী জীবনকে আনন্দঘন করে রাখবে - যাতে তিনি একাকিত্ব বোধ না করেন। (অবশ্য বস্তুবাদীরা এর

সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তাঁর পক্ষে এটা করা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার।)

এছাড়া বারযাখী জীবনে নাফ্স্ তার পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ কর্মের স্মৃতিসমূহ থেকে সুখ-দুঃখ বোধ করে। অবশ্য পার্থিব জীবনেও মানুষ এভাবে অতীত স্মৃতির স্মরণে প্রীত বা ক্লেশ বোধ করে। তবে পার্থিব জীবনে মানুষ তার অনেক স্মৃতি একেবারেই ভুলে যায়; আদৌ মনে করতে পারে না এবং অন্যান্য স্মৃতি সময়ের ব্যবধানে ক্রমেই ফিকে হয়ে আসে, ফলে তার সুখকর ও কষ্টকর প্রতিক্রিয়াও ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসে। কিন্তু 'আলামে বারযাখে তার সমস্ত স্মৃতিই চলমান ঘটনাবলীর ন্যায় সুস্পষ্টরূপে তার স্মরণ হবে। ফলে তার সুখকর ও কষ্টকর প্রতিক্রিয়াও পার্থিব জীবনে অতীত স্মৃতিচারণের তুলনায় অনেক বেশী হবে, বরং ঐ সব ঘটনা সংঘটিত হবার সময়কার অনুভূতির ন্যায় তীব্র অনুভূতি হবে। তবে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে যে সব পাপকর্মের মধ্যে সুখ ও আনন্দ লাভ করেছিলো সেগুলোর প্রতিক্রিয়ায় যেহেতু বারযাখী জীবনে তার জন্য বহু শাস্তির উপকরণ তৈরী হয়ে গিয়েছে সেহেতু সে ঐ সব স্মৃতি থেকে চরম আত্মপীড়ন অনুভব করবে ও সে জন্য আফসোস্ করবে। অন্যদিকে পার্থিব জীবনে সে সত্য ও ন্যায়ের পথে যে সব কষ্ট ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছে সেগুলোর প্রতিক্রিয়ায় বারযাখী জীবনে তার জন্য বিভিন্ন নে 'আমত তৈরী হয়ে যাবার কারণে ঐ সব স্মৃতি থেকে সে অপার্থিব পরমানন্দ অনুভব করবে।

মানুষ যে তার পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ কর্মসমূহ ঘটমান অবস্থায় আখেরাতের জীবনে দেখতে পাবে কোরআন মজীদে তা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

"সেদিন (শেষ বিচারের দিনে) লোকেরা দলে দলে বহির্গত হবে যাতে তাদেরকে তাদের আমল সমূহ দেখানো হয়। সুতরাং যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে তা সে দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমান মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।" (সূরাহ্ আয্-যিলযাল্ : ৬-৮)

এ থেকে মনে হয় যে, শেষ বিচারের মাঠে লোকেরা তাদের ভালো-মন্দ আমল সমূহ সবাক চলচ্চিত্রের ন্যায় দেখতে পাবে। আর এটা আজ অকাট্য বৈজ্ঞানিক সত্য যে, মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষেই তার সারা জীবনের, এমনকি তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জেনেটিক কোড আকারে লিপিবদ্ধ আছে। অসম্ভব নয় যে, তা তার শরীরের অধিকতর ক্ষুদ্র অংশে অর্থাৎ প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে, যদিও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত তা চিহ্নিত করার ও তাকে সবাক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি, কেবল বড় বড় বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

যা-ই হোক, তা শুধু কোষেই রেকর্ডকৃত থাক বা অণু-পরমাণুতেও লিপিবদ্ধ থাক, আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু মানুষের আমলকে কোড আকারে রেকর্ড

করার ব্যবস্থা করেছেন সেহেতু সে কোডকে সবাক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা তাঁর জন্য খুবই সহজসাধ্য। সম্ভবতঃ ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামার সত্যায়নের লক্ষ্যে এ সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে। কারণ, নইলে নাস্তিক, কাফের ও পাপাচারী লোকেরা হয়তো ফেরেশতাদের ওপর মিথ্যা লেখার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে।

আর যেহেতু ‘আলামে বারযাখ্ হচ্ছে আখেরাতের জীবনের প্রতিচ্ছবি সেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, সেখানেও লোকেরা তাদের সারা জীবনের কাজকর্ম সবাক চলচ্চিত্রের ন্যায় দেখতে পাবে। অবশ্য সেখানে যদি এভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শন করা না-ও হয় এবং নাফসগুলো কেবল তাদের অতীত জীবনকে স্মরণ করে, তো সে ক্ষেত্রে তাদের সে স্মৃতি হবে চলমান ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ন্যায় জ্বলজ্বলে এবং তার সুখকর ও কষ্টকর প্রতিক্রিয়া যে পার্থিব জীবনের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অনেক বেশী তীব্র হবে তাতে সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্ট

শয়ত্বান কি স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম?

এ মর্মে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, শয়ত্বান্ মানুষকে স্বপ্নে ভয় দেখাতে পারে। কেউ ভীতিকর স্বপ্ন দেখলে অনেক সময় বলা হয় যে, শয়ত্বান্ তাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে এ স্বপ্ন দেখিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শয়ত্বানের পক্ষে কি আদৌ মানুষকে কোনো স্বপ্ন দেখানো সম্ভব?

মানুষ স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে, আর কোরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা তার নাফসকে অধিগ্রহণ করে নেন। অর্থাৎ ঘুমন্ত মানুষের নাফসকে খোদায়ী ব্যবস্থাধীন একটি ভিন্ন জগতে নিয়ে যাওয়া হয় - যেখানে নাফসগুলো নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, শয়ত্বানের পক্ষে এমন একটি জগতে প্রবেশ করা এবং সেখানে অবস্থানরত মানুষের নাফসকে স্বপ্ন দেখানো কি সম্ভবপর? এ প্রশ্নের জবাব স্বভাবতঃই "না" । শয়ত্বানকে এ ধরনের ক্ষমতা দেয়া হবে এটা অকল্পনীয়।

তাছাড়া শয়ত্বানের কাজ হচ্ছে মানুষকে ওয়াস্ওয়াসা দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং পাপ কাজে প্রলুব্ধ করা। স্বপ্নে কাউকে ভয় দেখানো তার কাজের মধ্যে পড়ে না। বিশেষ করে, মানুষ ভীতিকর,

এলোমেলো ও বিশ্রী স্বপ্ন দেখলে অনেক ক্ষেত্রেই জাগ্রত হবার পর দো 'আ-দুরূদ পাঠ করে, নফল 'ইবাদত করে ও আল্লাহর কাছে পানাহ্ চায় এবং কাজকর্মে সতর্কতা অবলম্বন করে ও গুনাহর কাজ পরিহার করে চলার চেষ্টা করে, ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক দৈনন্দিন অভ্যাসের চেয়েও অতিরিক্ত দান-ছ্বাদাক্বাহ্ করে। সুতরাং, নিঃসন্দেহে শয়ত্বান্ এমন কাজ করে না যার প্রভাবে মানুষ পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতএব, এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, শয়ত্বান্ কাউকে স্বপ্ন দেখাতে পারে না বা পারলেও ভীতিকর স্বপ্ন দেখাতো না।

তাহলে ভীতিকর এবং এলোমেলো ও 'অর্থহীন' স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?

আমরা আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যে সব কাজ, চিন্তা বা পরিকল্পনা করে তা 'আলামে মালাকূতে বা 'আলামে বারযাখের একটি অংশে অবস্তুগত ও প্রতীকী বা রূপক মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং 'আলামে আখেরাতে প্রতীকী বা রূপক কিন্তু বস্তুগত মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তার নাফসকে 'আলামে মালাকূতের বা 'আলামে বারযাখের যে অংশে নিয়ে যাওয়া হয় সে সেখানকার অনেক অবস্তুগত মূর্ত ঘটনাবলী ও দৃশ্যের মুখোমুখি হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ং তাতে অংশগ্রহণ করে। এখানে সে যেমন তার নিজের কাজ, কথা ও চিন্তা-পরিকল্পনার অবস্তুগত মূর্ত রূপের মুখোমুখি হতে পারে, তেমনি তার সম্বন্ধে অন্য লোকদের কাজ, কথা ও চিন্তা-পরিকল্পনার অবস্তুগত মূর্ত রূপেরও

মুখোমুখি হতে পারে। এ সব দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আনন্দজনক ও ভীতিকর উভয় ধরনের ঘটনা ও দৃশ্যই থাকতে পারে। তেমনি থাকতে পারে এলোমেলো রূপ - যা আপাতঃদৃষ্টিতে ‘অর্থহীন’ বলে মনে হয়। এছাড়া তাকে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো কিছুর আভাস দেয়া হতে পারে এবং এ আভাস কোনো ঘটনার হুবহু ভবিষ্যত রূপ আকারে বা বাণী আকারেও হতে পারে, আবার প্রতীকী আকারেও হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে পার্থিব জগতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে অথবা শয়ত্বানের সাথে যে সব আন্তঃক্রিয়া সংঘটিত হয় সে সবেরও অবস্তুগত প্রতীকী রূপ ‘আলামে বারযাখের সংশ্লিষ্ট অংশে সঞ্চিত হয় এবং স্বপ্নে ব্যক্তিকে তার মুখোমুখি করা হতে পারে।

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন স্নায়বিক উত্তেজনায় ভোগে তখন সাধারণতঃ ঘুমের মধ্যে এলোমেলো স্বপ্ন দেখে। এ কারণে অনেকে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে দাবী করে যে, স্বপ্ন হচ্ছে স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল অর্থাৎ মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কল্পনা করে তা-ই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আকারে দেখে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। যদিও জাগ্রত অবস্থার অন্য অনেক চিন্তা-পরিকল্পনা ও ঘটনার ন্যায় স্নায়বিক উত্তেজনাও অবস্তুগত রূপ ধরে ‘আলামে বারযাখের সংশ্লিষ্ট অংশে সঞ্চিত হতে পারে এবং ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে তা স্বপ্ন আকারে দেখতে পারে, তবে

ব্যক্তি কদাচিৎ তা হুবহু স্বপ্নে দেখে থাকে। বরং মানুষ স্বপ্নে ভালো-মন্দ যা-ই দেখুক, বিরল ব্যতিক্রম বাদে সাধারণতঃ তা রূপক আকারে দেখে থাকে।

মানুষ মূলতঃ তার স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় ও শিথিল হয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়ে। সুতরাং স্নায়বিক উত্তেজনার পর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন যদি সে স্বপ্নে দেখে যে, সে একটা বদ্ধ কক্ষ থেকে বের হতে চাচ্ছে, কিন্তু বের হতে পারছে না, তা তার জাগ্রত অবস্থার কল্পনার প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তা হচ্ছে তার মানসিক অস্থিরতা ও দিশাহারা অবস্থার অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, জাগ্রত অবস্থায় সে যে বিষয়টি নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলো সে সমস্যারই অবস্তুগত ও রূপক মূর্ত রূপ। তেমনি নাপাক বিছানায় ঘুমালে মানুষ সাধারণতঃ আজেবাজে ও এলোমেলো স্বপ্ন দেখে, তার কারণ, সে নাপাক বস্তুর মালাকূতী রূপের ও তার মূর্ত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

এভাবে প্রাণী-অপ্রাণী নির্বিশেষে পার্থিব জগতের প্রতিটি সৃষ্টির এবং প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা, কল্পনা, পরিকল্পনা, মানসিক অবস্থা ও ঘটনারই মালাকূতী মূর্ত রূপক রূপ আছে এবং তা সুনির্দিষ্ট রূপান্তর বিধি অনুযায়ী 'আলামে মালাকূতে বা 'আলামে বারযাখের সুনির্দিষ্ট অংশে সঞ্চিত হতে থাকে যদিও সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ধারণা নেই।